# রাতের পোশাক

# রাতের পোশাক

দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

অক্ষর প্রকাশন

Rater Poshak
A Bengali Novella
by
Dwijendra Bhowmik
ISBN: 978-93-5258-949-4

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৪২৩ । মে ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ : পৌষ ১৪২৪ । জানুয়ারি ২০১৮

স্বত্ব ÷ ভাস্বতী ভৌমিক

এক শত পঞ্চাশ টাকা

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: দ্বিজেন্দ্র ভৌমিক

অক্ষর প্রকাশন ৭৩ সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট দ্বিতীয় তল কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে
ওয়াহিদা বেগম -কর্তৃক প্রকাশিত

অক্ষর বিন্যাস : বাণী মৈত্র । অ্যাপেক্স সলিউশনস্ । কলকাতা ৭০০১১২
মুদ্রক : ডি ডি অ্যান্ড কোম্পানি । কলকাতা ৭০০০০৯

আমাকে সহ্য করেন যাঁরা
এবং
আমার উপর বিরক্ত হন যাঁরা

আমাকে গ্রহণ করবেন যাঁরা
এবং
আমাকে বাতিল করবেন যাঁরা

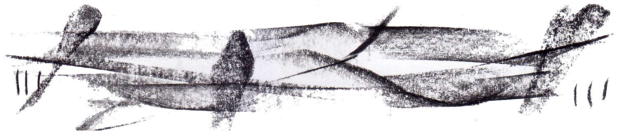

## বাঁচো মুদ্রায় বাঁচো প্লবতায়

অফিস থেকে বের হওয়ার মুখে অমৃতাভ শুনল তার টেলিফোন আছে। সামান্য বিরক্তই হলো সে। কেননা এখন বেরুতে একটু দেরি হলে দুটো চল্লিশ মিনিটের নৈহাটি লোকাল আর ধরা হবে না। তবু, অগত্যাই বলা চলে, বড়োবাবুর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। রিসিভার রাখা ছিল টেবিলে। বড়োবাবুর সঙ্গে এক ঝলক হাসি বিনিময় করে সেটা কানের কাছে তুলে ধরল সে: "হ্যালো, অমৃতাভ সেন বলছি।" অপর প্রান্ত থেকে ভেসে এল অচেনা গলার স্বর: "আমি অরণ্য। মৌমিতার বন্ধু। ওর কাছে আমার নাম শুনে থাকবেন হয়তো।" অমৃতাভ নামটা মনে করবার আপ্রাণ চেষ্টা করল, কিন্তু কোনোভাবেই মনে পড়ল না, মৌমি আদৌ কখনো অরণ্যর কথা তাকে বলেছিল কি-না। অভ্যাসবশে আঙুলে নাক ঘষে উত্তর দিল, "হুঁ... কিন্তু... আমাকে কী দরকার?" অমৃতাভ লক্ষ করল উলটোদিকে বড়োবাবু হাঁ করে কথা গিলছে। লোকটাকে সপাটে একটা চড় কষাতে ইচ্ছে হলো। অথচ বড়োবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে পুনরায় হাসলই সে। লোকটাও হ্যাংলার মতো হাসল আর, চেয়ারে একটু নড়ে-চড়ে বসে আরো মনোযোগ দিয়ে তার কথা গিলতে লাগল।

"মৌমিতা হাসপাতালে।"

"কেন? কী হয়েছে?"

"অ্যাক্সিডেন্ট। আপনাকে দেখতে চায়।"

"কোন্ হাসপাতাল? বেড নম্বর?"

"নীলরতন। আপনি সাড়ে তিনটের মধ্যে প্রাচী সিনেমার সামনে চলে আসুন। আপনাকে আমি চিনি, আমিই ওর কাছে নিয়ে যাব আপনাকে।"

"ঠিক আছে। কিন্তু... আপনি আমাকে চিনলেন—"

অমৃতাভর কথা শেষ-না-হতেই অরণ্য রিসিভার নামিয়ে দিয়েছে। মৌমির অ্যাক্সিডেন্টের খবরে বেশ বিচলিতই হয়ে পড়েছিল অমৃতাভ। এমনকি, অরণ্যকে যে জিজ্ঞাসা করবে, আঘাত কতটা মারাত্মক, কবে হয়েছে, বা, এখন মৌমি কেমনই-বা

আছে, সেসব বেমালুম ভুলে গিয়েছিল। রিসিভার নামিয়ে হন্তদন্ত হয়ে সে দৌড় লাগাল বাসস্ট্যান্ডের দিকে।

তিনটের মধ্যেই প্রাচীতে পৌঁছে গেল অমৃতাভ। সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ঠায় দাঁড়িয়ে রইল। পৌনে চারটার সময় একটা সিগারেট ধরাল। চারটের সময় আরো-একটা। সেইসঙ্গে শুরু হলো পায়চারি। সোয়া চারটের সময় উড়াল পুলের ঠিক নীচে হঠাৎ শোরগোলের শব্দ শুনতে পেল সে। দেখল, একদল লোক চিৎকার করতে করতে দুদিকের ট্রাফিক থামিয়ে একজন যুবককে পাঁজাকোলা করে প্রাচীর বিপরীতে নীলরতন সরকার হাসপাতালের মূল ফটকের দিকে চলে গেল। যুবকটির উপর এক ঝলক নজর গিয়ে পড়েছিল অমৃতাভর। সারা শরীরে চাপ চাপ রক্ত। হাত-মুখ থেতলানো। দৃশ্যটা দেখার পর সমস্ত শরীর তার অবশ হয়ে এল। বন্ধ হয়ে গেল পায়চারি। মৌমির কথা ভেবে ভেতরে ভেতরে সে যেন ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছিল। দরদর করে ঘামছিল আর, ভীষণ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল।

"কী হয়েছে তোমার?" পরিচিত অথচ খুব দূর থেকে নিচুগ্রামে ভেসে-আসা কণ্ঠে ঘুরে দাঁড়াল অমৃতাভ।

মৌমি।

মৌমি!

হতচকিত হয়ে গেল সে। চোখকে বিশ্বাস হচ্ছে না। গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না তার। কিছুক্ষণের জন্য যেন চেতনা হারিয়ে সে জড়পিণ্ডে পরিণত হয়ে গিয়েছে।

"তুমি? অরণ্য যে টেলিফোনে... অরণ্য কোথায়?" অগোছালো, অসহিষ্ণু অমৃতাভ।

"তোমাকে আমার খুব দরকার। আমি ডাকলে যদি না আসো, তাই অরণ্যকে দিয়ে মিথ্যা টেলিফোন করিয়ে নিয়ে এসেছি তোমাকে।" ধীর, অবিচল মৌমিতা।

"তাই বলে এত বড়ো একটা মিথ্যে কথা! আমি তো ভয়ে...।" বিহ্বল, বিপর্যস্ত অমৃতাভ।

"ভয়? আমার জন্য ভয় হয় তোমার?" তির্যক, তীক্ষ্ণ মৌমিতা।

"শুধু তোমার জন্য কেন, যে-কোনো পরিচিতের জন্যই তো এমন ভয় হওয়া স্বাভাবিক।" সংযত, মানবিক অমৃতাভ।

"তুমি কি তেমন স্বাভাবিক?" উচ্ছল, ব্যঙ্গাত্মক মৌমিতা।

এবারে খুব রাগ হলো অমৃতাভর। মৌমির জন্য সমস্ত মমতা নিমেষে মিলিয়ে গিয়ে জেগে উঠল ক্রোধ। কথা বলতে আর ইচ্ছা করছিল না। তবু—

"বেশ। কী দরকার বলো। আমার একটু তাড়া আছে। মাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে আজ।" ইচ্ছা করেই বানিয়ে বলল সে।



"তাহলে থাক। যাও তুমি।"

এই হলো মৌমিতা। নিজের দরকারে নিদারুণ মিথ্যা কথা বলে ডেকে এনেছে অমৃতাভকে। অথচ এখন চলে গেলে একবারের জন্যও আটকাবে না তাকে।

"আমি বলেছি তাড়া আছে। তার মানে কি এখনই দৌড়াতে হবে? এত করে আমাকে ডেকে এনে এখন বলছ, থাক। বাঃ!"

"বাঃ নয় অমৃত। মাকে ডাক্তার দেখানো আমার কথাগুলোর থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমাকে যা বলার তা না-হয় দুদিন পরেও বলা যাবে।"

অমৃতাভর ইচ্ছা করছিল ওকে বলে, যে-কথা দুদিন পরেই বলা চলে তার জন্য শুধু শুধু অ্যাক্সিডেন্টের গল্প ফাঁদার দরকার ছিল কী? কিন্তু মৌমি যদি সত্যি সত্যিই কথাগুলোকে না বলে চলে যায়? দরকারি কথাগুলো শোনার জন্য তারও যে ভিতরে ভিতরে এক প্রবল কৌতূহল জমে উঠেছে।

"চলো, আগে কোনো রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসি। তারপর না-হয় বাদানুবাদ করা যাবে।"

"বেশ। তোমার সময় হয়ে গেলেই বোলো আমায়। ডাক্তারের সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ক-টায়?"

"ঠিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। তবে মাকে ডাক্তার দেখানো দরকার, ক-দিন ধরে হাঁটুতে ওঁর একটা ব্যথা হচ্ছে।" এই কথাটার মধ্যে অবশ্য মিথ্যে নেই কোনো।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে মৌলালির সামনে ছোট্ট রেস্টুরেন্ট পেল। ছোটো, কিন্তু দোতলা। দোতলায় উঠে ততোধিক ছোটো একটা টেবিলে মুখোমুখি বসল ওরা। বসতে বসতে অমৃতাভ দেখল, অদূরে আর-একটা টেবিলে মোটাসোটা গোছের এক ব্যক্তি পিছন ফিরে বসে আছে। ডান পায়ের পাশে ব্রিফকেস। কেন জানি ব্রিফকেসটা তার খুব চেনা চেনা বোধ হলো। রেস্টুরেন্টের সিলিং থেকে ঝাঁঝরির ফাঁক গলে মৃদু আলো ছড়িয়ে পড়েছিল টেবিলগুলোর উপর।

অদ্ভুত এক আলো-আঁধারি পরিবেশ। পরস্পরের মুখও দেখা যায় না প্রায়। একটু জোরে শব্দ হলে বুঝি বাতিগুলো ভেঙে পড়বে, চারদিকের নরম শৃঙ্খলা ভেঙে গিয়ে এক চরম বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়বে। এরই মধ্যে টেবিলের সামনে ওয়েটার এসে দাঁড়াল। মেনুচার্টে দ্রুত চোখ বুলিয়ে অমৃতাভ ভেজিটেবিল পকৌড়ার অর্ডার দিল। মৌমি পকৌড়া খেতে ভালোবাসে।

"শোনো অমৃত, কিছুদিন ধরে আমি মানসিকভাবে খুবই বিপর্যস্ত আর কনফিউজড। কিচ্ছু পড়াশোনা হচ্ছে না।"

"কারণ?"

“বলতে পারব না। কোনো কাজে মন বসাতে পারছি না। কিছুই ভালো লাগছে না আমার। এমনকি তোমাকে ভাবতেও।”

“এই জন্যই কি গত তিনমাস বারবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েও দেখা পাইনি?”

“হয়তো হ্যাঁ। হয়তো-বা না-ও। আমার এই ভালো-না-লাগা তোমার কেমন মনে হবে সেই কথা ভেবে এড়িয়ে গেছি তোমাকে, আবার প্রতি মুহূর্তে হাঁপিয়ে উঠেছি কথাটা বলার জন্য।”

“কেন?”

“কেননা আমি জানি তুমি আমাকে ভালোবাসো। আমার ভালো চাও।”

“তুমি চাও না?”

“চাই।”

“ভালোবাসো না?”

“বুঝতে পারি না ইদানীং।”

“অন্য কাউকে মনে ধরেছে নাকি?” সামান্য রসিকতার ঢঙ এনে বলল অমৃতাভ।

“ঠিক তেমন নয়। কেবলই মনে হচ্ছে তোমাকে ভালোবাসতে পারছি না আমি। বিশ্বাস করো।”

“এর মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোনো ব্যাপার নেই মৌমি। তুমি সত্য বলতে পারছ না। সত্যকে ভয় পাচ্ছ, তাই সহজ হতে পারছ না।”

“ভয় নয় অমৃত। কী সত্য, কী নয়, সেই দ্বিধাই আমাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে।”

অমৃতাভ বুঝতে পারল মৌমির সঙ্গে ভিতরে ভিতরে কখন যেন তার এক অদৃশ্য দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই কারণ আছে তার। কিন্তু মৌমি সেই কারণের কাছে অকপট হতে পারছে না। আবার তাদের এতদিনের সম্পর্ককেও অস্বীকার করতে পারছে না। এই তিন মাস সময়ে অনেকটাই প্রস্তুত হয়েছে মৌমি, আরো কিছুকালের অবকাশ পেলে ওর দ্বিধা, ওর কল্পিত বিবেকবোধ শিথিল হয়ে আসবে, তখন সহজেই এড়িয়ে যেতে পারবে অমৃতাভকে।

শীর্ণ, তোবড়ানো-গাল, বরফ-শীতল-চোখ, কিম্ভূত-পোশাক ওয়েটার টেবিলে খাবার সাজাতে সাজাতে জিজ্ঞাসা করল, “চা না কফি?” যেন এর পরে চা বা কফি খাওয়াটাই দস্তুর।

“তুমি তো চা বা কফি খাও না। ঠান্ডা খাবে?” জিজ্ঞাসা করে অমৃতাভ। এই মুহূর্তে খাবার এসে পড়ায় মৌমি যেন স্বস্তি পায়, বুঝতে পারে সে।

“না।”



“এক কাপ লিকার চা। চিনি কম।” নির্দেশ পেয়ে চলে যায় ওয়েটার।

“তুমি কি অন্য কোনো চাকরির চেষ্টা করবে না আর? বা পড়াশোনা?” মৌমিতা জিজ্ঞাসা করে।

“এই মুহূর্তে নয়। এইসব ভালো লাগছে না আজকাল। পড়াশোনা অথবা চাকরির পরীক্ষা।”

“ডিপার্টমেন্টাল প্রমোশনের পরীক্ষাও তো দিতে পার?”

“ভবিষ্যতে পারি হয়তো, তবে এখনই নয়। কিন্তু, হঠাৎ এসব প্রশ্ন কেন?”

“কী ব্রিলিয়ান্ট কেরিয়ার তোমার! অথচ সেই তোমার কেরানির চাকরি ভালো লাগে?”

“চাকরিই করতে ভালো লাগে না, তার কেরানি বা ইঞ্জিনিয়ার। কিন্তু এতসব জানার তো তোমার দরকার নেই মনে হয়। নয় কি মৌমি?”

“দরকার নেই বলছ কেন?”

“যেখানে আমার জীবন থেকেই নিজেকে তুমি সরিয়ে নিতে চাইছ, সেখানে এইসব ব্যক্তিগত জিজ্ঞাসার কি গুরুত্ব আছে কোনো? আর কিছুকাল পর, রেস্টুরেন্টের এই অতীতটুকুই হয়তো পড়ে থাকবে শুধু। আমরা জানতেও পারব না আমাদের মধ্যে জীবিত কে, মৃতই-বা কে।”

“আমি নিজেকে তোমার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছি, এমন মনে হলো কেন? আমি একটা সত্যকে শুধু বলতে চেয়েছি তোমায়— *কিছুই বুঝতে পারছি না*— এই তো! এর বেশি...”

“ওই কথাটুকুর মধ্যে সত্য নেই কোনো। দ্বিধা কোনো সত্যের কথা বলে না মৌমি। তোমার সংশয় আমাকে বলে দিচ্ছে, আমাদের সম্পর্ক তোমার মনে আর নতুন কোনো আবেগ জাগায় না। বদলে তোমার মনে ক্রমে আশ্রয় নিয়েছে উদ্‌বেগ।”

ওয়েটার চা নিয়ে আসে।

“এবার উঠব অমৃত। আরো দেরি হলে মা চিন্তা করবেন। তাছাড়া তোমারও তো মাকে ডাক্তার দেখানো আছে।”

“বেশ, চলো তবে।”

“আরে, চা-টুকু তো শেষ করে নাও।”

“থাক।”

“কেন? থাকবে কেন?”

“ইচ্ছা করছে না। তার চেয়ে একটু খোলা আকাশের নীচে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো লাগবে মনে হয়।”

ঠিক এই সময় সেই মোটাসোটা লোকটির দিকে পুনরায় চোখ চলে গেল অমৃতাভর। মৌমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তগুলো ভেঙে যেতেই কি সে চারপাশের মুহূর্তে এসে পড়ল তবে? লোকটার পিছন ফিরে তাকানোতে মনে হলো অনেকক্ষণ ধরেই ও যেন তাদের লক্ষ করছে। ইচ্ছে করে এক মুহূর্ত অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে আবার লোকটার মুহূর্তে ফিরে তাকাল সে। এবার চোখাচোখি হতেই চিনতে পারল অমৃতাভ— আরে, এ তো আমাদের অফিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট চিফ সুপারিনটেনডেন্ট! ব্রিফকেসটা তাই তখন অত চেনা-চেনা লাগছিল? লোকটা এ-সময় এখানে কেন? একা একা কী করছে ও? চুপি-চুপি কি এতক্ষণ ওদের ফলো করছিল? নিজের মধ্যে এমন-সব প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না পেয়ে একরাশ বিরক্তি আর অস্বস্তি গ্রাস করল অমৃতাভকে।

"কই? চলো?" মৌমিতার প্রশ্নে ঘুরে তাকাল সে।

"আরেকটু বসবে মৌমি? প্লিজ।"

"কেন? আরো একটু কেন?"

"ওই-যে টেবিলে বসে আছে লোকটা, পায়ের কাছে ব্রিফকেস, আমার বস। আমাদের এই রেস্টুরেন্টে ঢোকার পর থেকেই ফলো করছে।"

"ফলো করবে কেন? তোমাকে চেনে বলে মাঝে-মধ্যে তাকাচ্ছে হয়তো।"

"আমাকে চেনে বলে কি আমার গতিবিধির উপর নজরদারির অধিকার বর্তায়?"

"দেখো, চেনা লোকের প্রতি এমন আগ্রহটা তো স্বাভাবিক।"

"কিসের স্বাভাবিক? এ ভারি অন্যায়। ওর এখানে এতক্ষণ বসে থাকার কারণ আর কিছু নয়— আমরাই—"

"সে না-হয় হলো, কিন্তু তাতে অন্যায় কিসের শুনি? তোমার বসও তো ভাবতে পারেন, তুমিই লক্ষ করছ ওঁকে?"

"তুমি বুঝতে পারছ না, আমি হলফ করে বলছি, ওর কোনো উদ্দেশ্য আছে, এম্‌নি এম্‌নি এতক্ষণ বসে নেই।"

"উদ্দেশ্য! কিসের উদ্দেশ্য? নাঃ, তুমি দেখছি আবোল তাবোল বকেই চলেছ। পাগলামি ছাড়বে? তুমি কি বলতে চাইছ ভদ্রলোক আগে থেকেই জানতেন, ঠিক এই সময় এই দিনে এই রেস্টুরেন্টে এই টেবিলে আমরা এসে বসব?"

"না, ঠিক তা নয়। কিন্তু আমরা এখানে আসার পর থেকে আমাদের কথাবার্তা আমাদের চলাফেরা সবকিছু ও জরিপ করে চলেছে!"

"করল তো বয়েই গেল! এখন চলো তো! কথায় কথায় ছ-টা বেজে গেছে।" নিজের রিস্টওয়াচের দিকে তাকিয়ে বলল মৌমিতা।

"হ্যাঁ চলো। ওর অবস্থান, ওর চাহনি আমি আর সহ্য করতে পারছি না।" বিল



মিটিয়ে মৌমির সঙ্গে বেরিয়ে এল অমৃতাভ। রেস্টুরেন্টের ভ্যাপসা আবহাওয়া থেকে মুক্ত হতে পেরে ভালো লাগল তার। কিন্তু যাঃ, কাঁধের ব্যাগটা যে ফেলে এসেছে ভুলে! "মৌমি, এক মিনিট দাঁড়াও, আমি এক্ষুনি আসছি" বলেই ছুট লাগাল। সিঁড়িতে পা দিয়ে সরাসরি মুখোমুখি পড়ে গেল বসের।

"ব্যাপার কী মিস্টার সেন? ফিরে এলেন?"

"স্যার... আপনি?" যেন এতক্ষণ ওকে দেখেইনি অমৃতাভ।

"আমি তো রেস্টুরেন্টেই ছিলাম... কোণের টেবিলে... দু-একবার যেন চোখাচোখিও হলো!"

"চোখাচোখি? না স্যার, একদম খেয়াল করিনি আপনাকে। আসলে ভিতরে এত কম আলো..."

"তা ঠিক। কিন্তু আপনি আবার ফিরে এলেন যে বড়ো?"

"কাঁধের ব্যাগটা ফেলে গিয়েছি।"

"তাই নাকি? তাড়াতাড়ি যান। দেখুন সেখানা আবার ফেরত পান কি-না?"

"হ্যাঁ।" বলেই এক লাফে দুটো সিঁড়ি লাফিয়ে উঠল সে।

"ওঃ হো মিস্টার সেন, কাল দুটোর সময় একবার আমার চেম্বারে আসবেন তো! কিছু কথা আছে।"

"নিশ্চয়ই স্যার।" ঘুরে উত্তর করেই সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত উঠে এল অমৃতাভ। ব্যাগটা ফিরে পাওয়ার তাগিদের থেকেও বসকে সে এড়াতে চাইছিল বেশি।

ওয়েটারের কাছ থেকে ঝোলাব্যাগটা নিতে সামান্য দেরিই হলো। মৌমিতার কাছে ফিরে এসে অমৃতাভ ব্যাগটা দেখিয়ে বলল, "এটা ফেলে এসেছিলাম। চলো তোমাকে ডানলপের বাসে তুলে দিই।"

"চলো।"

"বসকে লক্ষ করলে মৌমি? আমরা যেই নেমে এলাম নীচে, ও-ও কেমন উঠে পড়ল! জানো, ওকে দেখলে আমার অনেকটা শুয়োরের কথা মনে হয়। ঘাড়ে-গর্দানে-পেটে-হাতে-পায়ে সব ছত্রিশ ইঞ্চি।"

"ছত্রিশ কি, আটচল্লিশ বলো!"

দুজনে সমস্বরে হেসে উঠল। প্রাচী-র সামনে আসতে-না-আসতেই মৌমি বাস পেয়ে গেল। অমৃতাভও ধীরে ধীরে শিয়ালদহ স্টেশনের দিকে হাঁটা লাগাল।

পরদিন ঠিক দুটোর সময় অ্যাসিস্টেন্ট চিফ সুপারিনটেনডেন্টের চেম্বারে হাজির হলো সে। পি.এ জানাল মিটিং চলছে, তাকে অপেক্ষা করতে হবে। পাক্কা দেড় ঘণ্টা বিরক্তিকর প্রতীক্ষার পর অমৃতাভ দেখল তাদের ইউনিয়নের নেতারা বসের ঘর থেকে

একে একে বেরিয়ে আসছেন। এক নেতা তার দিকে তাকিয়ে 'কী ব্যাপার' জিজ্ঞাসা করাতে সে উত্তর দিল, 'স্যার ডেকেছেন'। নেতারা চলে যেতে পি.এ বলল, "এবারে যেতে পারেন ভিতরে।" যেতে যে এবারে সে পারে, সেকথা পি.এ না বললেও চলত! কিন্তু এক রাশ ক্লান্তি ও ক্ষোভ নিয়েও এখন ছুটির এত পরে তাকে স্যারের সঙ্গে দেখা করতেই হবে। যে-মানুষ অমৃতাভর সময়ের কোনো মূল্য দেয় না, অথচ সেই মানুষটিরই নির্দেশকে, ওকেই মান্যতা দিতে শত বিরক্তি সত্ত্বেও চেম্বারে ঢুকে হাসতে হবে। এইভাবে এমনই বিড়ম্বনা তাকে প্রতিদিন নানাভাবে নানা সম্পর্কের ভিতরে সহ্য করে যেতে হবে। হ্যাঁ, যতদিন বাঁচবে সে। এটাই প্রচলিত নিয়ম। এভাবেই গোটা ব্যবস্থা টিকে চলে।

"খুবই দুঃখিত আমি। আপনাকে এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। কিন্তু কী করব বলুন, আপনাদেরই ইউনিয়ন যখন-তখন ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে চলে আসেন। দেখা না করলে তো আপনারাই আবার বিক্ষোভ করবেন, ইনক্লাব জিন্দাবাদ। সারাদিন ইউনিয়নের হাজার-একটা সমস্যা শুনব না অফিসের কাজ করব? এই চেয়ারে বসলে আপনারা কী করতেন বলুন তো?"

অমৃতাভ বুঝল অ্যাকটিভ ইউনিয়নিস্ট বলেই তাকে এতসব বলছে বস। তার এতক্ষণের প্রতীক্ষা, সময়ের অপচয় তারই কাঁধে চাপিয়ে দিতে চাইছে। লোকটা শুধু ধড়িবাজ বলেই নয়, দুঁদে আমলা হিসেবেও তার কাছ থেকে ক্রমশ সমীহ আদায় করে নিতে চাইছে। মনে মনে ভাবল লোকটাকে বলে, ইউনিয়নের কথা শোনাও আমলাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

"ছোটোখাটো সমস্যা মেটাতে দু-ঘণ্টা লেগে গেল স্যার, আশ্চর্য তো!" অমৃতাভ হাসি মাখিয়ে তার উপহাসকে মৃদু করে নিতে চাইল।

"শুনবেন সমস্যাটা?"

"না, ওসব থাক! বরং আমাকে ডেকেছেন কেন সেই কথা বলুন।"

"বেশ। তবে কথাটা কিন্তু আনঅফিসিয়াল। ব্যক্তিগতই বলতে পারেন। অনধিকার-চর্চা মনে হলে বলুন আমি আর সে-প্রসঙ্গ তুলব না।"

"বলবেন বলে যখন ভেবেইছেন স্যার— বলুন, শুনছি।"

"কাল আপনার সঙ্গে যে-মেয়েটিকে দেখেছিলাম তার নাম মৌমিতা বসু। নয় কি?"

প্রশ্নের প্রসঙ্গে চমক লাগে অমৃতাভর। এতখানি ব্যক্তিগত বিষয়ে কথা বলবেন বস, ভাবতেই পারেনি সে। একটা নীরবতা বিরাজ করতে থাকে ওদের মধ্যে।

"আসলে মৌমিতার বাবা আমার বিশেষ পরিচিত। আমাকে আপনার কথা জিজ্ঞাসাও



করেছিলেন একদিন। আমি কিন্তু কোনো এনকোয়ারি করছি না। মানে—"

"এ-ব্যাপারে আমি কোনো আলোচনা করতে চাই না, প্লিজ!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় অমৃতাভ। একটু বেশিই যেন উত্তেজিত হয়ে পড়েছে সে। "আপনার অন্য কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে করুন, কিন্তু মৌমিতা-প্রসঙ্গে কোনো কথার জবাব দিতে মোটেই বাধ্য নই আমি।"

"ঠিক আছে। আপনি যেতে পারেন। এতটা উত্তেজনা আশা করিনি। সত্যিই আমি দুঃখিত। আপনার কোনো সেন্টিমেন্টে ঘা দিয়ে ফেলেছি হয়তো।" বিনয় নয়, বসের বলার ভঙ্গিতে বরং ঔদ্ধত্যই প্রকাশ পেল।

"আমিও দুঃখিত স্যার। চলি।" অমৃতাভ যথেষ্ট সংযতভাবে কেটে কেটে বলল।

বলেই, দ্রুত ঘরটার ঘিঞ্জি পরিবেশ থেকে বেরিয়ে এল সে। মনে হলো, এতক্ষণ বসেছিল তলিয়ে-যাওয়া এক অন্ধকার গর্তের ভিতর, আর তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নখদন্তহীন একটা শুয়োর, ওর বেঢপ শরীরের সমস্ত ক্লেদ নিয়ে। ঘোঁৎ ঘোঁৎ একটা শব্দ এখনও তার চারপাশে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। অফিসের বাইরে, রাস্তাতেও সেই শব্দ তাকে তাড়া করে ফিরল অনেকক্ষণ। ধীরে ধীরে লোকের ভিড়ে মিশে তবে সেই শব্দ এড়াতে পারল সে। নগরজীবনের প্লবতায় খানিক স্বস্তি পেল।

**প্লবতা**

বাড়ি ফিরতে ফিরতে, ভেবে দেখল অমৃতাভ, বেশ কিছুকাল, বিশেষত যেদিন থেকে পথেঘাটে একা একা চলতে শিখল, অভিভাবকের প্রয়োজন রইল না আর, সেইদিন থেকে কেউ-না-কেউ কোনো-না-কোনো সময়ে লক্ষ করে চলেছে তাকে। সে বার বার নিজের অজান্তেই অন্য-সব মানুষের মুহূর্তে গিয়ে পড়ছে আর হারিয়ে ফেলছে তার নিজের মুহূর্তগুলোকে। একটা অজানা বন্ধন থেকে নিজেকে কোনোভাবেই মুক্ত করতে পারছে না। এক নির্দিষ্ট গতির গভীরে, সম্পর্কের ভিতর, পূর্বনির্ধারিত এক বলয়ের মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। এর বাইরে বেরুবার কোনো স্বাধীনতা নেই। এক প্লবতার মধ্যে ভাসমান তার ভারকেন্দ্র, নির্দিষ্ট এক কম্পাস তাকে টেনে নিয়ে চলেছে অনাবিষ্কৃত সব আয়তনের ভিতর। পৃথিবীতে কোনো মহামানব কি কখনো বেঁচে ছিলেন ব্যক্তি-অনন্তের মধ্যে? সমস্ত মহাপুরুষেরাও তবে কি নির্দেশিতই ছিলেন তাঁদের যাপনে? তাঁদের কাজের সীমার মধ্যে? জানে না অমৃতাভ। শুধু জানে, তার বেঁচে-থাকা হলো একটা পদ্ধতি, একটা প্রক্রিয়া। তার চৈতন্যে যা কিছু প্রকাশিত, তা সময়ের পরিধি আর স্থানের পরিমিতির মধ্যে ভাসমান। তার প্রত্যেক পদক্ষেপ, অস্তিত্বের খুঁটিনাটি জরিপ করে চলেছে কেউ-না-কেউ। কোনো-না-কোনো সময়ে। গোচরেই হোক বা অগোচরে।

প্রসঙ্গত একটি দিনের ঘটনা খুব মনে পড়ে গেল অমৃতাভর। মৌমিকে, ওদের

বাড়িতে যেদিন প্রথম স্পর্শ করে শিহরিত হয়েছিল, সেই দিনই কী-এক আকস্মিকতায় তার একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের মধ্যে জড়িয়ে গিয়েছিল অপরিচিত এক লোক। মৌমিদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হেঁটে আসছিল বাসস্ট্যান্ডের দিকে। রাত তখন আটটা। হঠাৎ মনে হলো কেউ অনুসরণ করছে তাকে। দাঁড়িয়ে পড়ল সে। দূর আকাশের স্তিমিত আলোয় বুঝতে পারল, লোকটাও দাঁড়িয়ে পড়েছে। মজা পেল। সোজা পথে বাসস্ট্যান্ডে না গিয়ে এ-গলি ও-গলি ঘুরতে লাগল সে। লোকটাও পিছন পিছন চরকি মেরে চলল। এবার মজার বদলে কৌতূহল হলো। লোকটা কী উদ্দেশ্যে অনুসরণ করছে তাকে? ছিনতাজ না তো? কোনো বদ মতলব? সামান্য ভয় পেল। আর এদিক-সেদিক না ঘুরে বাসস্ট্যান্ডের দিকে সোজা হাঁটা লাগাল। লোকালয়ের দূরে ওর সঙ্গে পাল্লা দেবার সাহস পেল না সে। তুলনায় লোকটা যে তার থেকে বলশালী অন্ধকারেও তা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছিল না।

কিন্তু বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোবার আগে চকিতেই ঘটনাটা ঘটল। তিন-চার জন ঘিরে ধরল তাকে। অনুসরণকারী লোকটি পিছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "ধরে রাখ, পালায় না যেন।" লোকটার কথা শেষ না-হতেই একজন অমৃতাভর কলার চেপে সজোরে ঘুসি বসিয়ে দিল নাকে। আত্মরক্ষার কোনো সুযোগ না দিয়ে অন্য-একজন ধাক্কা মেরে ফেলে দিল রাস্তায়। নাকে হাত দিতেই অমৃতাভ টের পেল গলগল করে রক্ত ঝরছে। "এ-পাড়ায় ঢুকে মেয়েদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি?" তৃতীয় জন পিঠে লাথি কষাল। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় আর আতঙ্কে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সে। অসহায়ের মতো তার শীর্ণ শরীর কুঁকড়ে দ হতে হতে যেন ক্রমশ ছোটো এক পিঁপড়ের মতো মিশে যাচ্ছিল মাটিতে। বেশ বুঝতে পারল অমৃতাভ, এখন যদি এরা মেরেও ফেলে তাকে, কেউ বাধা দিতে আসবে না। অসংখ্য পোকার অবিরত মৃত্যুর মতো পৃথিবীর গাঢ়তম অন্ধকারে তার নিয়তির কথা চাপা পড়ে যাবে। হয়তো-বা কাগজে দু-এক লাইন ছেপে বেরুবে সে-খবর। হয়তো তাও না। তারপর পরিচয়-অপরিচয়ে হারিয়ে যাবে এই জীবন। নাম অমৃতাভ সেন। বাড়ি খড়দহ। বয়স কুড়ি। সেই অনুসরণকারী লোকটি ইতিমধ্যে কাছাকাছি চলে এসেছে: "এই, তোরা বেশি মারধর করিস না। থানায় নিয়ে চল। পুলিশের রুলের গুঁতোয় ব্যাটা ইভটিজিংয়ের মজা টের পাবে।"

"এই শালা, ওঠ্!" একজন কলার টেনে ধরল। যন্ত্রের মতো উঠে দাঁড়াল অমৃতাভ। উঠতে কষ্ট হচ্ছে খুব; মনে হচ্ছিল, রাস্তাতেই শুয়ে থাকে সে। কিন্তু এখন নিজের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই আর। এই লোকগুলোর হাতের পুতুল বনে গেছে সে।

"চল্, হাঁট্!" অন্য-একজন ধাক্কা লাগাল। অমৃতাভ হাঁটতে শুরু করল। এখন তার মাথার ভিতর কোনো চিন্তা নেই, নেই মৌমিকে স্পর্শের সেই শিহরন। শুধু মনে হলো, ডুবে যাচ্ছে সে। ডুবতে ডুবতে কুঁকড়ে আসছে দেহ। ভয়ে? লজ্জায়? নাকি লোকগুলোর আচমকা আক্রমণে? নিজের দেহের উপরেও কোনো অধিকার নেই আর তবে?



থানায় ঢুকে কিছু সময়ের প্রতীক্ষায় সামান্য স্বাভাবিক হয়ে এল সে। কুঁকড়ে থাকার বদলে এই পরিবেশে বরং নিজেকে তার অসহায় আর, বড়ো একা বোধ হতে লাগল। মনে হলো, কোনো দিন সে-যে কোনো মেয়েকে কোনো ইশারা বা ইঙ্গিত করেনি, সেই সহজ সত্য কাউকেই আর বিশ্বাস করাতে পারবে না। সমবেত মানুষের মিথ্যার কাছে তার একার সত্য যত ধ্রুবই হোক্-না-কেন, কোনো গুরুত্ব নেই। সত্য তার একার নয়, জীবন তার একলার নয়; সকলের করুণা ও বিচারের উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। সততা, নিষ্ঠা, সংযম— এইসব তার নিজের চেতনা নয়। চারপাশের লোকজনের মতামতের মানদণ্ডের উপর ভরসা করে স্থির হয়ে আছে। ভালো কিংবা খারাপ, সত্য বা মিথ্যা— এইসব বৈপরীত্যগুলি সমাজের নিরাপত্তা ও অনুশাসনের শুধুই এক-একটি বহিরাবরণ মাত্র।

নাকে খুব ব্যথা করছিল। অমৃতাভ হাত দিয়ে দেখল বেশ ফুলে উঠেছে, আশেপাশে রক্ত জমাট বেঁধে আছে। এরই মধ্যে লোকগুলো ডিউটি অফিসারের কাছে তার বিরুদ্ধে যাবতীয় অভিযোগ জানিয়ে দিয়েছে। অতএব সেই মুহূর্ত থেকে সে লোকগুলোর নিয়ন্ত্রণ থেকে থানার নিয়ন্ত্রণে স্থানান্তরিত হয়ে গেল। ডিউটি অফিসারকে তখন ভয়ে ভয়ে অনুরোধ করল: "একটু নাক-মুখ ধুয়ে আসব স্যার?"

"নিরাপদ, এই ছেলেটাকে কলের কাছে নিয়ে যা।" অফিসারের নির্দেশ পেয়ে রোগা, কালো, ঢ্যাঙা, তুবড়ানো-গাল লোকটি, পরনে খাকি প্যান্টশার্ট, কাছে এসে বলল, "চলো। তবে নিরাপদের সঙ্গে নো চালাকি। চুপচাপ যাবে আর তাড়াতাড়ি চলে আসবে। আমার রুলের গুঁতোয় বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খায়।" লোকটাকে কেন জানি ভালো লেগে গেল অমৃতাভর। মনে হলো, ওর মধ্যে মানুষ আছে। কোনো ভয় তো হচ্ছেই না, বরং এই মুহূর্তে ওর সঙ্গে একটু গল্পগাছা করলে আরাম পাবে সে। কলের কাছে যেতেই মৌমিদের বাড়ির খাবারগুলো হরহর করে বমি হয়ে গেল। নোংরা ভাঙা বেসিন পরিষ্কার করতে করতে আয়নায় দেখতে পেল তার মুখে-বুকে-গলায় চাপ চাপ রক্ত। শুধু মুখ আর নাকটাই ধুল সে। আঁজলা ভরে জলও খেল।

"নাক-মুখ অত সাফ করে আর কী হবে? ডিউটি অফিসারকে তো চেনো না, হুঁ হুঁ? প্রথমে মার, পরে বিচার।" খইনির ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল নিরাপদ। শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল অমৃতাভর মন। ডিউটি অফিসার যদি পুরো ঘটনার বিবরণ জানতে চায় কী উত্তর দেবে সে? কিছু বলার আগেই যদি মারধর করতে শুরু করে তাহলে তো তার

মুখ দিয়ে আর কোনো শব্দই বেরুবে না। ছোটোবেলায় বাবা কিংবা মা কখনো মারলে সে চুপ করে থাকত। কান্না পেত, অথচ চোখে জল আসত না। কষ্ট হতো, কিন্তু কখনো বাবা-মাকে স্বীকার যেত না— আর দুষ্টুমি করবে না। কিন্তু আজ তাকে যেভাবেই হোক্-না-কেন সব বলতে হবে। মৌমিকে তার পড়ানোর কথা। মৌমিদের বাড়ির কথা। তাদের বাড়ির কথা। নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার একটা চেষ্টা তো তাকে করতেই হবে! এইসব ভাবতে ভাবতে যখন অফিসারের ঘরে পুনরায় এসে ঢুকল, দেখল, প্যাকাটি-মার্কা, ঝাঁকরা-চুল, হাতে-বালা একটি ছেলেকে চুলের মুঠি ধরে রুল দিয়ে পেটাচ্ছে লোকটা। ছেলেটি থেকে থেকে বলেই চলেছে "আর হবে না, মায়ের দিব্যি স্যার।" "মায়ের দিব্যি? শালা পকেট মারছ আর এখানে এসে মায়ের নামে দিব্যি কাটছ? তোর মায়ের ইয়ে করি শ্লা" বলে, পেটে ভারী বুটের এক লাথি কষিয়ে ওকে মাটিতে পেড়ে ফেলল লোকটা। "অ্যাই নিরাপদ, মালটাকে লক-আপে পোর।" বলে, নিজের পোশাক ঠিক করতে করতে নির্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসল। নিরাপদ ছেলেটির কলার ধরে হির হির করে ছেঁচড়াতে ছেঁচড়াতে নিয়ে গেল। যেন ময়লার বস্তা নিয়ে যাচ্ছে। অমৃতাভ? তারও পরিণাম কি তবে ওই পকেটমারের মতোই হবে? ডিউটি অফিসার বা নিরাপদদের কাছে, এই থানার চৌহদ্দির ভিতর, তার এবং পকেটমারের তো কোনো প্রভেদ নেই! ভয়টা পুনরায় ফিরে আসছে। ক্রমাগত কুঁকড়ে যাচ্ছে সে।

"নাম?" ডিউটি অফিসারের প্রশ্ন শুনতেই পেল না অমৃতাভ।

"নাম কী?" দ্বিতীয়বারে শুনল বটে, বুঝতে পারল না প্রশ্নটা তার উদ্দেশেই কি-না!

"এই হারামজাদা, তোর নাম কী?" টেবিল চাপড়ে রীতিমতো ধমকে উঠল ডিউটি অফিসার।

"আমাকে বলছেন?" থতমত জানতে চাইল অমৃতাভ।

"না তো কি ওই দেয়ালকে বলছি?" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠল লোকটা।

"সরি স্যার, বুঝতে পারিনি। আমার নাম অমৃতাভ, অমৃতাভ সেন।"

"বয়স?"

"কুড়ি।"

"কী করিস?"

"পড়াশোনা, টিউশনি।"

"কোন্ কলেজে পড়িস?"

"রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী কলেজ।"

"থাকিস কোথায়?"

"খড়দহ।"



"এখানে কী করছিলি?"

"একজনকে পড়াতে এসেছিলাম।"

"নাম?"

"মৌমিতা বসু।"

"মেয়েছেলেকেই পড়াস দেখছি? বাবার নাম?"

"কার স্যার? আমার?"

"না, মেয়েটির।"

"তিমির কান্তি বসু।"

"বাড়ি কোথায়?"

"এল নাইন বাসস্ট্যান্ডের পশ্চিমদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে যে-পুকুরটা পাওয়া যায়, তার ধারে।"

"ভদ্রলোককে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করব তোর কথাগুলো সত্যি না মিথ্যে?"

"সব সত্যি স্যার। আপনি জিজ্ঞাসা করুন ডেকে।"

"তা, এরা-যে অভিযোগ করছেন, তুই নাকি এই ভদ্রলোকের মেয়েকে উত্ত্যক্ত করিস?"

"ভুল স্যার। নিশ্চয়ই ওঁদের কোনো ভুল হচ্ছে।"

"আপনারা তো ওই পাড়ারই আশেপাশে থাকেন। তিমিরবাবুকে চেনেন?"

"ওদিকে তো সবই নতুন বাড়ি। ঠিক বলতে পারব না স্যার।" একজন জবাব দিল।

"এমন সময় তিরিশোর্ধ্ব এক যুবকের নেতৃত্বে দশ-বারোজনের একটি দল সেখানে প্রবেশ করল। তাদের দেখে সকলে একটু যেন তটস্থ হয়ে উঠল।

"এই-যে স্যার, সাত দিন তো হয়ে গেল, এখনও আপনারা ইসমাইলের খুনিদের হদিশ করতে পারছেন না? নাম-ধাম বলে দিলেও যদি ধরতে না পারেন তাহলে আছেন কী করতে? এরপর তো দেখছি খুনিদের ধরার কাজও আমাদেরকেই করে দিতে হবে।" তিরিশোর্ধ্ব যুবকটি জোরের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করল। অমৃতাভ স্পষ্ট চিনতে পারল। গৌতমদা। শাসকদলের যুবফ্রন্টের অগ্রণী নেতা। বছর দু-এক আগে এই গৌতমদা যখন ছাত্র রাজনীতি করত তখন নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এখন কি চিনতে পারবে তাকে? চিনলেও অবিশ্বাস করে বসবে না তো? তবে কি এড়িয়ে যাবে পরিচয়? ঘুরিয়ে নেবে মুখ? সে-যে অন্যায় করেনি কোনো, নিজের উপর এই আস্থাটুকুও যেন আর ধরে রাখতে পারছে না। চারদিককার অনাস্থা-অবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে নিজের প্রতি এক তীব্র ঘৃণা টের পেল সে। কিন্তু না। থানার এই অশ্লীল চৌহদ্দি

থেকে, একটা মিথ্যা অপবাদের থেকে, জংলি লোকগুলোর বর্বরতা থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে। গৌতমদার কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া তার অন্য কোনো উপায় নেই।

"বদমায়েশগুলো আমার এলাকা থেকে ভেগেছে কি-না, তাই সামান্য দেরি হচ্ছে গৌতমবাবু।" অত্যন্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে কথাগুলো উচ্চারণ করল ডিউটি অফিসার।

"ওসব এলাকা-ফেলাকা বুঝি না। এক সপ্তাহের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা না হলে কী করলে কী হয় তা আমাদের ভালোই জানা আছে।" তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিমায় গৌতমদা বলল।

"প্লিজ আর ক-টা দিন অপেক্ষা করুন। কোথায় পালাবে? সর্বত্র জাল ফেলা আছে।"

"জালের গপ্পো আর করতে হবে না। ওই জাল কেটেই তো বেটারা ভেগেছে। যাক, আপনার সঙ্গে বেশি কথা বলার সময় নেই আমার। এক সপ্তাহ টাইম দিয়ে গেলাম। ব্যস।" বলে চেয়ার পিছন দিকে ঠেলে উঠে দাঁড়াল গৌতমদা: "চল্ রে তোরা।"

"গৌতমদা—" মরিয়া ডেকে উঠল অমৃতাভ।

"কে? আরে অমৃতাভ না? এ কী হয়েছে তোর! অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?"

"না, সেসব নয়। এঁরা আমাকে মেরে-ধরে নিয়ে এসেছেন থানায়। আমি নাকি কোন্ মেয়ের পিছনে লেগেছি! এসেছিলাম টিউশন পড়াতে। পড়িয়ে ফেরার পথে আমার এই হাল করেছেন এঁরা। কোনো কথা শোনার প্রয়োজনও বোধ করেননি।"

অমৃতাভর সঙ্গে গৌতমদার পরিচয়ে লোকগুলো থতমত খেয়ে যায়। দ্রুত ওদের মুখের ভাব বদলে যেতে থাকে। গৌতমদা এই এলাকার ছেলে। অনুসরণকারী লোকটিকে তাই চেনে। "কী ব্যাপার বিনয়দা, সত্যি নাকি? কোন্ মেয়েকে টিজ করেছে ও?"

"লোকেশ বলছিল, এই ছেলেটি প্রায়ই আমার বাড়ির জানালার সামনে এসে দাঁড়ায়। মেয়েটা বড়ো হয়েছে। দু-এক দিন ওর পড়ার বইয়ের ভাঁজ থেকে লাভ-লেটারও পেয়েছি। ভাবলাম কাণ্ডটা এরই!"

"কিরে! এনার বাড়ির সামনে দাঁড়াস নাকি প্রতিদিন?"

"ওঁর বাড়ি কি-না বলতে পারব না, তবে, প্রতিদিনই একটা নির্দিষ্ট বাড়ির সামনে আমার সিগারেট শেষ হয় আর, সেটা পা দিয়ে চেপে নিভিয়ে ফেলতে পাঁচ-দশ সেকেন্ড দাঁড়াতেও হয়।" অমৃতাভ প্রত্যুত্তর করল।

"ছিছি বিনয়দা, শুধু সন্দেহের বশে ছেলেটার এই হাল করেছেন? এ আমাদের খড়দহের ছাত্র সংগঠনের সম্পাদক।"

"ইশ্! তাহলে বোধহয় খুব ভুল হয়ে গেছে!" বিনয় নামের লোকটি যারপরনাই বিনীত স্বরে কথাগুলো বলল, "এফআইআর তুলে নিচ্ছি আমরা। কিন্তু মেয়ের বইয়ের



মধ্যে যে-চিঠিগুলো পেয়েছি?"

"এই-সব ধরপাকড়, মারধর করার আগে মেয়েকে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করলেই তো পারতেন বিনয়বাবু! খামোকা আমাদেরও তো কম হয়রান করলেন না—" ডিউটি অফিসার সুযোগ পেয়েই যেন গলে যেতে চাইলেন গৌতমদা, বিনয়বাবু ও অমৃতাভদের বৃত্তের মধ্যে।

এতক্ষণে নিজের ভিতর একটা হালকা ভাব মালুম হতেই অমৃতাভর বিনয়বাবু ও তার সাঙ্গোপাঙ্গদের উপর ভীষণ রাগ হলো। মনে হলো, প্রত্যেকের নাকে সে-ও একটা একটা করে সজোরে ঘুসি চালায়!

"মাফ করবেন অমৃতাভবাবু। ভুল হয়ে গেছে বড়ো।" বিনয়বাবুর মুখে 'বাবু' সম্বোধন শুনে নিজেকেই ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো তার। লোকটাকে অপমানজনক কিছু-একটা বলতে চাইল, কিন্তু পারল না। কেন জানি তার গলা বসে গেছে, কোনোভাবেই কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারছে না সে।

এই ঘটনার কথা মনে পড়লে আজও নিজেকে নিদারুণ অসহায় লাগে তার। ছাত্র সংগঠনের সাথে যদি কোনো যোগ না থাকত, গৌতমদার সঙ্গে না-কোনো-পরিচয়, তাহলে তো সেদিন আরো অনেক হেনস্থা হতে হতো তাকে? নিতান্ত কাকতালীয়ভাবেই তো গৌতমদা ওই দিন ঠিক ওই সময়ে থানায় এসেছিল!

অমৃতাভর আরো মনে পড়ল ওই দিন বাড়ি ফিরে শুয়ে শুয়ে রাগে-দুঃখে-যন্ত্রণায়-অভিমানে-অপমানে তার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এসেছিল ক-টা সস্তা কাঁচা খিস্তি: "শালা, শুয়োরের বাচ্ছা! যত বেজন্মার দল সব!"

## আশরীর জারিত ভঙ্গিমা

এক আকাশ অন্ধকারে শুয়ে আছে অমৃতাভ। ইতস্তত নর-নারী আলিঙ্গনাবদ্ধ বসে। দূরে ভিক্টোরিয়ার চুড়ো থেকে ঝল্‌মলে আলো ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের চারপাশে। চিৎ হয়ে শুয়ে শুয়ে সে-আলোর ছটায় আকাশটাকে অদ্ভুত লাগে। মাথা কাত করলে মিনারশিখরের পরিকে দুলতে দেখা যায়। আচ্ছা, গগনচুম্বী পরিটি কিসের প্রতীক? রোমান্টিকতা? মিথ? নাকি ভিক্টোরীয় উন্নাসিকতা? শিল্প, না বৈভব?

মৌমিতার সঙ্গে বইমেলায় এসেছিল আজ। মৌমি বিদায় নিলে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে অন্ধকার ময়দান পেরিয়ে এইখানে এসেছে সে। সোঁদা সোঁদা ঘাসের উপর প্রথমে উপুর, পরে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখছে। দেখছে তারাদের অলোক জীবন। বছর পঁচিশের একটি মেয়ে তাকে দুই-দুইবার পারাপার করে গেল। একা মেয়েটি কি কাউকে খুঁজছে? এই বিস্রস্ত নির্জনতায়? কৌতূহলে উঠে বসল অমৃতাভ। মেয়েটি আবারও আসছে। কী মনে হলো, উঠে দাঁড়াল সে। মেয়েটি নিকটে চলে এল। বলল: "দশ টাকা দিলে তোমার সঙ্গে বসতে পারি।" পথে-ঘাটে প্রতিদিনের চেনা এক তীব্র গন্ধ নাকে এসে বিঁধল অমৃতাভর। ঘাম ও সেন্টের সেই ঘ্রাণ লাফ দিয়ে পড়েছে বেড়ালের মতো, হাত-পা অবশ হয়ে আসছে, থেকে থেকে আঙুলগুলো কেঁপে উঠছে। মুখে যেন ক্ষরণ ঘটে চলেছে লালার। কিছুক্ষণ পরে তা হয়তো চুঁয়ে চুঁয়ে নেমে আসবে ঠোঁট বেয়ে। শুধু তার দুটি চোখ আরো গোপনতা, আরো নিকষ অন্ধকার খুঁজতে চাইছে। তবু কেন মনে হলো মেয়েটির শাড়ির রং নীল?

"কী? রাজি?"

রাজি কি অরাজি জানে না অমৃতাভ। শুধু জানল, কোন্‌-এক সম্মোহনে সে এগিয়ে চলেছে নীল শাড়ির সন্নিকটে। তারপর পাশাপাশি বসেও পড়ল আর, মনে হতে লাগল কোনো অতীত নেই তার। ভবিষ্যৎও। হাত নেই, পা নেই। মেয়েটি ব্যতিরেকে চারদিকে প্রাণ নেই কোনো। ধীরে ধীরে সেই নিষ্প্রাণ জগতের ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে সে।



"যা করবার, তাড়াতাড়ি। আমার বেশি সময় নেই। তাই বলে কামড়াকামড়ি করবে না কিন্তু।" এই বলে নীল শাড়ি তার ব্লাউজ আর ব্রেসিয়ারের বন্ধন খুলে অমৃতাভর হাতটা টেনে নিল। অমৃতাভর মনে হলো কোনো মেয়েমানুষ নয়, একটা মাংসের পিণ্ড তার হাতের স্পর্শে গলে গলে যাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু ঘামে ভিজে আঙুলগুলো চুপসে যাচ্ছে। চোখ-মুখ-শরীরে জড়িয়ে যাচ্ছে একের পর এক তন্তু। বন্ধ হয়ে আসছে দম। মুখের ভিতর থেকে প্রবল ফেনা বেরিয়ে মেয়েটির স্তনযুগলের ঘনীভূত স্বেদের ভিতর মিশে যাচ্ছে। স্নায়ুতন্ত্রের তীব্র এক নিষ্পেষণ তার যৌনাঙ্গের ভিতর জমাট হয়ে তাকে বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে সমস্ত অস্তিত্ব আর অন্ধকারের নিবিড়তা থেকে, অবিরল শ্বাসাঘাতের থেকে। অবশেষে যখন শ্বাস প্রায় স্থির হয়ে এল, মেয়েটি তাকে ছেড়ে চলে গেল অদূরে বেঁটে মোটা এক প্রৌঢ়ের দিকে। অমৃতাভ দেখে নিতে চাইল মেয়েটির শান্ত নিষ্ক্রমণ, কিন্তু ততক্ষণে তার দু-চোখ বন্ধ হয়ে গেছে। উঠতে চাইল সে। কিন্তু পড়ে গেল। সেই তন্তুগুলি যেন তার সমস্ত শরীরকে বেঁধে রেখেছে। প্রাণপণে তাদের সরাতে সরাতে সেই অন্ধকার বৃত্ত থেকে টলতে টলতে সে বাসস্ট্যান্ডের উদ্দেশে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল। আর দেরি নয়, তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

এই দৃশ্যছবি ও পটকথা আজ পুনরায় মনে এল শান্তিনিকেতনের ধূসর প্রান্তে। কেন এল মনে? স্মৃতির কারণে? কয়েকদিন আগে মৌমির একখানা দীর্ঘ চিঠি হস্তগত হয়েছে তার। মোদ্দা যেকথা বেরিয়ে এসেছে সেই চিঠি থেকে, তা হলো: মৌমিতা এতদিন অমৃতাভকে ভালোবাসতে চেয়েছিল, চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ইদানীং মনে হচ্ছে, ভালোবাসতে ব্যর্থ হয়েছে ও। এতে অমৃতাভর কোনো দুর্বলতা নেই; নেই কোনো ভ্রম। ভালোবাসার বদলে ভয় ও শ্রদ্ধা ক্রমাগত ওকেই ঠেলে দিয়েছে দূরে। আজ তাই ওদের সম্পর্কের টানাপোড়েন থেকে মুক্তি পেতে চাইছে মৌমি।

মুক্তি? হায়, ঘৃণাই হয়েছিল অমৃতাভর। মৌমির অসহায়ত্বের কথা ভেবে করুণাও। কিন্তু তার থেকেও বড়ো, চিঠিটি পড়বামাত্র, বুকের ভিতর এমন-এক শিথিল যন্ত্রণা হয়েছিল যে, অনুভূতিহীন প্রত্যন্ত কোনো দেশে, বিবর্ণ এক আকাশের নীচে, ক্যাঁচরকোঁচর আর ঘ্যাঁসঘ্যাঁস শব্দের সময়ের মাঝে ক্রমাগত আর ঠায় দাঁড়িয়ে থেকেছিল অমৃতাভ। কতক্ষণ? মনে নেই তার। কিন্তু বইমেলার সেই দিনটি বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল। মনে পড়ে যাচ্ছিল নীল (?) শাড়ি মেয়েটির জরুল রং, খয়েরি (বা কৃষ্ণবর্ণ) ঠোঁট, স্তনবৃন্ত, উরুযুগলের কথা। মনে পড়ছিল পরিচয়হীন সেই মেয়েটিকেই, যার দেহের কোনো অংশ হয়তো-বা জানেনি ভালোবাসা কাকে বলে। হয়তো জানবে না কোনোদিন; কারণ, হয়তো যে-ছায়া নিয়ে মেয়েটি প্রতিদিন হাঁটে, সেই ছায়ার কোনো আকার নেই; আছে শুধু কসমেটিক ঘাম, আছে তীব্র থেকে তীব্রতম ক্ষরণ আর ক্ষয়। কিংবা ক্ষুধা।

হায় ক্ষুধা প্রতিহিংসাপ্রবণ!

শান্তিনিকেতনে, লালমাটি আর সোনাঝুরি গাছের অবকাশে মনে হচ্ছে এইসব। একটা কোনো গন্ধ আসছে দূরের। সে কি এই বাতাসের? নাকি গন্ধটাই ঘুরে-ফিরে আজও মেয়েটির অনুষঙ্গে টেনে নিয়ে চলেছে তাকে? তাহলে মৌমির কথাও-বা মনে আসছে কেন? নাকি এই-যে গন্ধ উড়ে বেড়াচ্ছে চারদিকে, তার সঙ্গে মৌমির দেহের ঘ্রাণেরও মিল আছে কোনো? মনে হলো, মৌমির স্তন দুটিও কি স্পর্শ পেলে কৃষ্ণবর্ণ সেই মেয়েটির মতোই গলে গলে পড়বে? নিতম্ব ও নাভিস্থলের বিন্দু বিন্দু স্বেদ ক্রমশ ভরিয়ে দেবে রোমকূপগুলিকে? ওষ্ঠযুগল হয়ে উঠবে বাদামি বর্ণের আর চটচটে? দেহ যেন মাকড়সার জাল, একদিন যা জড়াতে জড়াতে, এমনকি, পালটে দিতে পারে তার অস্তিত্ব, বদলে দিতে পারে তার প্রতিস্ব! অমৃতাভ জানে না, বুঝতে পারে না, মৌমি আসলে প্রেম, হৃদয়, অভিমান না নারীত্বের বিপর্যস্ত, জরদ্গব, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.এ?

ভাঙা খাঁড়ি আর এক আকাশ সন্ধের মাঝামাঝি বসে থাকতে থাকতে আরো অনেক ঘটনাই চলে আসছিল মনে। একাকিত্বের বন্ধু যে হলো মন! ওই-যে পাখিরা দূরান্ত থেকে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে তাদের বাসায়, অথবা দল বেঁধে মেঝেনিরা চলেছে নিজেদের ঘরে কিংবা একটা ব্যাঙ লাফ মেরে নেমে গেল জলের ভিতর অথবা ভেসে আসছে পাতাদের নিরলস খসখস শব্দের শিহরন— তবু, এবং তবুও তো তার মনের কাছে সে নিঃসঙ্গ, বড়ো একা। তাই কি এক সময়ের ভাবনা থেকে আর-এক সময়ের ভাবনায় ভেসে চলে যাচ্ছে? একদিন শ্রমণার সঙ্গেও তো এইখানে এসেছিল অমৃতাভ। সেদিন জঙ্গলের আড়ালে সাইকেল রেখে খাঁড়ি বেয়ে নেমে গিয়েছিল নীচে। তারপর শীর্ণ জলের পথ ধরে হেঁটে গিয়েছিল বহু দূর! কেউ কোনো কথা বলেনি বহুক্ষণ। একটা গুহার মতো মুখে এসে শ্রমণা বলেছিল শুধু, "আমার ভয় করছে অমৃতদা। সারা শরীর কাঁপছে।"

"কেন?"

"জানি না।"

"শরীর খারাপ করছে? ফিরে যাবে?"

"না। ওই পাথরের উপর বসব কিছুক্ষণ।"

বসেছিল শ্রমণা। কোনো কথা না বলে। অমৃতাভ এগিয়ে গিয়েছিল একটা গাছের কাছে। তার আড়ালে বসে সে ছোটো ছোটো নুড়ি কুড়িয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছিল জলের ভিতর।

ভারি অদ্ভুত মেয়ে এই শ্রমণা। ঠান্ডা অথচ ঝকমকে, ভেজা কিন্তু কঠিন, মিষ্টবাক তবু উদ্ধত। মৌমি যখন অমৃতাভর থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, ঠিক তখন একদিন



ঋতুদের বাড়িতে শ্রমণার সঙ্গে আলাপ। তারপর বহুবার ওদের কখনো কলকাতায়, কখনো-বা শান্তিনিকেতনে দেখা হয়েছে। মাস পাঁচ-ছয় পরে সম্পর্ক যখন ক্রমশ ঘনিষ্ঠতর, হয়তো ভালো-লাগা ভালোবাসার মাঝামাঝির কোনো-এক পর্যায়ে, হয়তো পরস্পরের আবেগ ছুঁতে চাইছে পরস্পরের বন্ধুতা, হয়তো হৃদয়ের ভিতরে কোনো আকাঙ্ক্ষা জেগে উঠছিল ধীরে ধীরে; ঠিক তখন-তখনই শ্রমণা সরিয়ে নিল নিজেকে। কোনো পূর্বাভাস না দিয়ে। অমৃতাভ যতবার গিয়েছে কাছে, ততবারই কোনো-না-কোনো কাজের অজুহাতে এড়িয়ে গেছে তাকে। তারও তিন-চার মাস পরে জেনেছিল, আঁকা-শেখা ছেড়ে শ্রমণা শান্তিনিকেতনের সংস্রব ত্যাগ করে চলে গেছে কলকাতায়। কোনোদিন তারপর আর মুখোমুখি দেখা হয়নি ওদের। একবার শুধু অফিস-ফেরত ট্রেনের জানালা থেকে বিধাননগর স্টেশনের একটি বেঞ্চিতে শ্রমণাকে আপনমনে বসে থাকতে দেখেছিল। ইচ্ছা করলে ট্রেন থেকে সেদিন নেমে যেতে পারত ওর কাছে। কিন্তু শ্রমণার মুহূর্তে, শ্রমণার তন্ময়তায় নিজেকে নিয়ে যেতে মন চায়নি তার। তাই শ্রমণার উপস্থিতির সেই ছোট্ট মুহূর্ত থেকে জোর করে সরিয়ে নিয়ে নিজেকে সে সঁপে দিয়েছিল ট্রেনের ভিতরের অসংখ্য মানুষের মুহূর্তের মধ্যে। অবিন্যস্ত, আবদ্ধ একঘেয়েমির ভিতর।

হয়তো এইখানেই শেষ হতে পারত শ্রমণার কথা। কিন্তু ঋতুর কথা না বললে সে-কাহিনি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। শ্রমণাই একদিন অমৃতাভকে বলেছিল, "তুমি কি জান অমৃতদা, ঋতু তোমাকে কত ভালোবাসে?"

"ভালোবাসে?"

"কোনোদিন বুঝতে দেয়নি তোমায়।"

"কিন্তু ও কি জানে না আমার দিক থেকে তেমন কোনো টান—"

"জানে। আর জানে বলেই নিঃশব্দে তোমার প্রতি ওর ভালোবাসায় যে-কষ্ট ও পেয়ে চলেছে তার তুলনা আমি জানি না।"

শ্রমণার সঙ্গে অমৃতাভ তখন আর কোনো কথা বলতে পারেনি। নিজের মনের মধ্যে সময়ের অবকাশ অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছিল। কী আশ্চর্য! শেষপর্যন্ত ঋতুর মতো মেয়ে এমন একটা ভুল করে বসল! সে তো কোনোদিন ওকে ভালোবাসতে পারবে না! পারবে কি? ভালোবাসা কি চেষ্টা করা যায়? এমনকি, তার শরীরের থেকে কোনো আবেগ কি কখনো ছুটে যেতে চেয়েছে ঋতুর শরীরের দিকে? নাঃ, কোনোভাবেই তেমন কোনো অনুভব টের পায়নি কখনো। এমনকি, আজ। এই ভেজা-ভেজা গন্ধের অবসরেও।

তবে কি ঋতুর কারণেই শ্রমণা ছেড়ে চলে গিয়েছিল তাকে? ঋতুর কাছে হার

মেনে কিংবা মনে মনে নিজেকে জয়ী ভেবে; আত্মপ্রসাদে।

ধীরে ধীরে চারদিক থেকে একটা শীতল অন্ধকার নেমে আসছে। তবু অমৃতাভর উঠতে ইচ্ছে করছে না আজ। বরং সে তার শরীরকে আরো এলিয়ে দিল মাটিতে। মৌমি-শ্রমণা-ঋতুদের অতীতে ঘুরতে ঘুরতে কেন যে নীল শাড়ি মেয়েটিকে মনে হয়েছিল তার!

নীল শাড়ি। হ্যাঁ এতদিনে নিশ্চিত অমৃতাভ, মেয়েটির পরনে ছিল নীল শাড়িই। নীল রঙের কারণেই ময়দানে-হারিয়ে-যাওয়া মেয়েটিকে সে আজ পুনরায় খুঁজে পেল মৌমি-শ্রমণা-ঋতুদের মধ্যে। অশরীরী হয়ে মেয়েটি যেন মিশে আছে ওদের প্রত্যেকের অংশভাক্ হয়ে।

**অশরীরী**

চলমান অশরীরী অরণ্যদেবের ছিল ডায়ানা। মৌমি-শ্রমণা-ঋতুদের সম্পর্কের ভিতর অমৃতাভর যে-অশরীর ঘুরে বেড়াত সে কোনো অরণ্যদেব ছিল না। নীল শাড়ি মেয়েটির শরীরের বিভঙ্গ দেখেছিল সে। যেন স্বল্পবাস ডায়ানাকে। অমৃতাভ কি তবে সেদিন মেয়েটির অরণ্যদেব হতে চেয়েছিল? চলমান অশরীরী! ছোটোবেলার ডায়ানাকে কি খুঁজে পেয়েছিল অন্ধকার মাঠের মধ্যে? মাত্র দশটি টাকার বিনিময়ে?

## অতন্দ্র প্রহরা যেন সময়ের ’পরে

অমৃতাভর স্বভাবের এক বৈশিষ্ট্যই হলো পথে পথে আপনমনে হাঁটা। হাঁটতে হাঁটতে সবকিছু দেখা, দেখতে দেখতে অনেক কিছুই ভাবা আর, ভাবতে ভাবতে নানারকম গল্প তৈরি করা। কিন্তু তার গল্পের কাহিনিগুলো সবসময়ে অসম্পূর্ণই থেকে যায়। পথচলতি মানুষের মুখে সে দেখতে পায় আনন্দ-বেদনা-উল্লাস-বিষাদ-রাগ-অভিমান। ভিতরে ভিতরে ওদের সঙ্গে কথাও বলে, চেষ্টা করে ওদের অনুভূতির স্পর্শ পাওয়ার। একা একা বেড়ানোয় তাই তার ক্লান্তি নেই কোনো। কিন্তু হেঁটে বেড়ানো মানে তো এই ঘিঞ্জি নোংরা শহর। বড়ো বড়ো মিনার, গম্বুজ আর অট্টালিকার ফাঁকে ফাঁকে টালি ও টিনের ছাউনি, তারই মধ্যে মধ্যে যানবাহন এড়িয়ে ফুটপাথ আর অ্যাশফল্টের রাস্তা বরাবর পেরিয়ে-যাওয়া লেভেল ক্রসিং! তারপর কখনো-বা সিঁড়ি নুয়ে পাতালের রেল, যেখানে আলো আর গানের নিবিড়ে ট্রেনের ঘটাং ঘটাং শব্দ! যেখানে অনেক অপরিচিতের ভিতরে পায়চারি, কখনো-বা পরিচয়ের দিক থেকে ঘুরে হঠাৎ অচেনায় মিশে-যাওয়া।

কাল রাতে বাড়ি ফেরেনি অমৃতাভ। বাড়ি মানে দুটো ঘর, সামনে দক্ষিণের এক চিলতে বারান্দা, উত্তরের দ্বিগুণ করিডোর। ইতস্তত ছড়ানো-ছেটানো বই। চুন-ধসা, স্যাঁতসেঁতে দেয়াল জুড়ে টিকটিকি, আরশোলা ও মাকড়সার অবাধ বিচরণ। রাত্রে ঘরের কোণ থেকে বেরিয়ে আসে দু-একটি কুনো ব্যাঙ হয়তো, আর, কেবলই ডাকতে থাকে। ঘুমের মধ্যেও সে-ডাক পৌঁছে যায় তার কানে।

কাল রাতে ইচ্ছা করেই বাড়ি ফেরে নি সে। অফিস-ফেরত চলে গিয়েছিল মৃণালদের মেসে। মৃণাল ছোটোখাটো ব্যাবসা করে। অমৃতাভর ছোটোবেলার বন্ধু।

সারারাত ছেলের কোনো খবর না পেয়ে সকালবেলা অমৃতাভর বাবা থানায় ডায়রি করে এলেন। অতএব, বাড়ি ফিরে তাকে বাধ্য হয়ে হাজিরা দিতে হলো থানায়। এই নিয়ে তৃতীয়বার আসা। দ্বিতীয়বার এসেছিল চাকরিতে জয়েন করার আগে, পুলিশি ভেরিফিকেশনের কারণে। অমৃতাভ সেন যে কোনো উগ্রপন্থী নয়, রাষ্ট্রদ্রোহিতায় অভিযুক্ত

কেউ নয়, চাকরিতে ঢোকার আগে সেই মর্মে পুলিশের সার্টিফিকেট প্রয়োজন। সেই সার্টিফিকেটের জন্য যার সামনে তাকে উপস্থিত হতে হয়েছিল, সেই লোকটার ছিল অনেকটা জলহস্তীর মতো দশাসই বপু। বেঁটে, পীতবর্ণ, এবড়োখেবড়ো দাঁতসুদ্ধ চিবুকটা ঝুলে পড়েছে, কুতকুতে চোখ দুটো থেকে যেন লোভ আর লালসা হামলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। লোকটা অবলীলায় তার কাছে মিষ্টি খাবার নাম করে একশো টাকা চেয়ে নিয়েছিল। যদি সত্যি সত্যিই রাষ্ট্রদ্রোহী বা উগ্রপন্থী হতো সে, তবে কি টাকার অঙ্কটা বেড়ে যেত শুধু?

এই তৃতীয়বার থানায় ঢুকতে ঢুকতে নিজেকে তার খুব একটা আড়ষ্ট লাগল না। বরং সোজা ডিউটি অফিসারের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় জানিয়ে দিল। জানাল, তিনি যেন দয়া করে ডায়রিটা উইথড্র করে নেন। অফিসারের অহেতুক প্রশ্ন এড়াতে সে নিজে থেকেই কতকগুলো মিথ্যা তৈরি করে নিয়েছিল, আর তাই, সেই-সব প্রশ্ন আন্দাজ করেই উত্তরগুলোকে গড়গড় করে বলে গেল। এক, কাল রাতে শেষ ট্রেন মিস হয়ে যাওয়ায় বাধ্য হয়ে তাকে বন্ধুর বাড়িতে থেকে যেতে হয়। দুই, টেলিফোনে অনেক চেষ্টা করেও বাড়িতে যোগাযোগ করে উঠতে পারেনি। তিন, থানা-পুলিশের অযথা হয়রানিতে আন্তরিকভাবেই দুঃখিত সে, অনুতপ্তও। কিন্তু কথায় বলে 'পুলিশে ছুঁলে চুয়ান্ন ঘা'। অতএব এক, জেরায় তাকে পড়তেই হলো। অতএব দুই, আগের মিথ্যাগুলোকে ঢাকতে আরো অজস্র মিথ্যা তৈরি করে যেতে হলো। অতএব তিন, ডিউটি অফিসারের বিরক্তিকর জিজ্ঞাসাবাদের যথাসাধ্য বিনীত উত্তর দিয়ে যেতে হলো।

"বন্ধুর বাড়ি কোথায়?"

"বাড়ি নয়, মেস। শিয়ালদহে। জগৎ সিনেমার পিছনে।"

"নাম?"

"মৃণাল সামন্ত।"

"বন্ধু কী করেন?"

"ব্যাবসা।"

"কিসের ব্যাবসা?"

"ছোটোখাটো অর্ডার সাপ্লাই।"

"নেশাভাঙ করেন?"

প্রশ্নের ঔদ্ধত্যে রেগে উঠতে পারত অমৃতাভ। কিন্তু সংযতভাবে বললে, "না।"

"তাহলে প্রায়ই বাড়ি ফিরতে দেরি হয় কেন?"

"ইউনিয়নের কাজ থাকে।" জোরের সঙ্গেই উত্তর দেয় সে। "তাছাড়া আমি বুঝতে পারছি না স্যার, যে-কোনো কারণেই হোক্-না-কেন বাড়ি ফিরতে পারিনি, কিন্তু তা



নিয়ে এত প্রশ্ন উঠছে কেন?"

"প্রশ্ন তো আর আহ্লাদে আটখানা হয়ে করছি না। আপনার বাবা ডায়রি করেছেন, সেই ডায়রি ক্লোজ করতে হলে জুতসই একটা কারণ তো দেখাতে হবে!"

"আপনার জুতসই কারণের নিয়মাবলি আছে কি কোনো?"

এমন বেচাল প্রশ্নে রেগে ওঠে অফিসার: "রাতে বাড়ি ফিরবেন না। বৃদ্ধ বাবা-মাকে ব্যতিব্যস্ত করবেন। সেইসঙ্গে আমাদেরও। অথচ এনকোয়ারিতে বিরক্ত? আপনাকে তো মশাই এতক্ষণে আমাদের লক-আপে পোরাই উচিত ছিল।" এই অসভ্য অভদ্র লোকটাকে একটা উপযুক্ত জবাব দেওয়া দরকার। কিন্তু আজ তার চারপাশে গৌতমদার মতো কেউ নেই, যার অভয় আশ্রয়ে থেকে সে থানা-পুলিশের বিরুদ্ধে লড়ে যেতে পারে। বেশ কিছুদিন হলো দল থেকে বেরিয়ে এসেছে অমৃতাভ। মনে হলো, ক্ষমতার কাছাকাছি থাকতে না পারলে সত্যি কত অসহায় একজন মানুষ! অগত্যা তাই চুপই করে থাকে অমৃতাভ।

"শুনুন, আর কখনো এমন কিছু ঘটাবেন না যাতে আমাদের হস্তক্ষেপ করতে হয়, ব্যতিব্যস্ত হতে হয়। ভদ্রঘরের ছেলে— ভদ্র হয়ে বাঁচার চেষ্টা করুন।"

কী সাহস! কী ঔদ্ধত্য! অমৃতাভকে শাসন করছে লোকটা। কত সহজে তার ব্যক্তিগত অধিকারে ঢুকে পড়ছে ক্রমশ! অথচ মোক্ষম কোনো জবাব দিতে পারছে না সে। অসহায়! কী নিদারুণ কী করুণ অসহায়! নিজেকে কেঁচোর মতো মনে হলো। মাটির ভিতর সেঁধিয়ে যেন নিজেকে আত্মগোপন করে নেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই কোনো। থানা বা প্রশাসনের আনুগত্য থেকে কোনোদিন কি তবে মুক্ত হতে পারবে না সে? হঠাৎ, কাকাতালীয়ই বলতে হবে, মনে পড়ে গেল দূরসম্পর্কের এক কাকুর কথা, যিনি বর্তমান শাসকদলের একজন মন্ত্রী। যাঁর অনুমতিপত্র নিয়ে একবার বিধানসভা অধিবেশন দেখতে গিয়েছিল; দেখেছিল শাসক ও বিরোধী -দলের সদস্যদের মধ্যে গালাগালি, হাতাহাতি ও আরো-সব কুৎসিত কাণ্ডকারখানা। কোনোদিন আর সেখানে যাবার বাসনা হয়নি। আজ, এই মুহূর্তে, থানার ভিতরে মনে হলো যেন অন্য-এক বিধানসভায় বসে আছে! সে-কারণেই কি মন্ত্রীকাকুর কথা মনে পড়ে গেল? ডিউটি অফিসারকে বলবে কি তাঁর কথা? দেখবে, কী প্রতিক্রিয়া হয় লোকটার? হয়তো নিজের এই অসহায় অবস্থা থেকে সাময়িক অব্যাহতি মিলতে পারে।

"দেখুন, আপনি তখন থেকে আপনার অধিকারের বাইরে যা-ইচ্ছে-তাই বলে চলেছেন।" অমৃতাভ বেপরোয়া হয়ে উঠতে চাইল।

"হোয়াট?" আচমকা আক্রমণে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে দাঁড়াল লোকটা।

"বসুন স্যার, শান্ত হয়ে বসুন। অবশ্য আমি এখন যাঁর কথা বলব, তাঁর নাম শুনলে

আপনি আপনাআপনিই বসে পড়বেন।" একটু ধমকের ঢঙেই বলল সে: "মাননীয় ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্প মন্ত্রী শ্রী বিকাশ সরকার আমার কাকু হন। আমি বাধ্য হব আপনার এইসব অভব্যতামির কথা তাকে জানাতে যে, শুধু শুধু তখন থেকে আমাকে হ্যারাস করে চলেছেন আপনি!" কথাগুলো এমনভাবে উচ্চারণ করল অমৃতাভ, যেন সে-ই মন্ত্রী। শোনামাত্র গিরগিটির মতো বদলে গেল অফিসারটির মুখভঙ্গি ও অভিব্যক্তি। যেন কোনো আকার নেই আর, শরীরটা হাড়ের বদলে শুধুই মাংসের তাল। তরলের মতো যে-পাত্রেই রাখা যাক-না-কেন তেমনই আকৃতি এখন ওর। এই মুহূর্ত থেকে, যেমন মনে হচ্ছে, লোকটা একটা কাঠের চেয়ার বনে গেছে!

"না মানে... আপনি... ভুল বুঝবেন না... কথাটা আগে বলতে পারতেন... আপনার মা-বাবার কথা ভেবেই... আমি...।" আমতা আমতা করে কথা বলছে, অথচ কোনো পূর্ণ বাক্য তৈরি করতে পারছে না বেচারা! অসহায়তা অমৃতাভর থেকে সরে গিয়ে এখন গ্রাস করেছে ওকে।

"দেখুন, আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমার মা-বাবার কথা ভেবেই আপনি আমাকে অত কথা বলেছেন!" শ্লেষাত্মক হয়ে ওঠে অমৃতাভর ভাষা: "আর কোনো কথা বলার দরকার নেই। শুধু বাবা যে-ডায়রি করে গিয়েছিলেন, তা তুলে নিলেই হবে।"

"সে হয়ে যাবে। একটু বসুন না! চা আনাই?"

"না। অনেক কাজ আছে আমার।" উঠে দাঁড়াল অমৃতাভ।

"চা খেয়ে যান, দেরি হবে না। গাড়িতে করে পৌঁছে দেব আপনাকে।" ডিউটি অফিসারের আতিশয্যে এবার রীতিমতো অস্বস্তি শুরু হলো অমৃতাভর। একপ্রকার জোর করেই বেরিয়ে এল থানার থেকে। পিছনে পিছনে লোকটাও।

"একটা কথা বলব?"

"বলুন।"

"মানে... আপনার কাকুকে... এই ব্যাপারটা—"

"নিশ্চিন্ত থাকুন। আপনার ক্ষতি হয় এমন কিছু বলব না তাঁকে। তবে আশা করব, ভবিষ্যতে আর আপনি কারো সঙ্গে এমন ব্যবহার করবেন না।" বলে, থানা ও অফিসারটির বলয় থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল অমৃতাভ। বাড়ির পথে পা বাড়াল।

## ঘরে ও বাইরে

বাড়ি। প্রতিবেশী। বন্ধুবান্ধব। আত্মীয়স্বজন। সকলকে নিয়ে যে-সম্পর্ক আমরণকালের, পরস্পরের থেকে কতদূর মুক্ত তা? পরিবার, সমাজ, দল বা রাষ্ট্র— সব সংগঠনেরই একটা নিয়ম আছে। নিয়মের ব্যতিক্রমী কোনো স্বাধীনতা নেই। কোনো মানুষেরই। অমৃতাভকে যেমন বাড়ি থেকে



বেরুলে সময়মতো ফিরতে হয়। নয়তো হাজিরা দিতে হয় থানায়। পুলিশের জেরা সহ্য করতে হয়। ইচ্ছা না করলেও প্রতিবেশীদের সঙ্গে হেসে কথা বলতে হয়। অফিসের বস যত অসভ্যই হোক্-না-কেন সম্মান জানাতে হয় তাকে। আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে চলতে হয়। ইউনিয়নের একঘেয়ে মিটিংগুলোয় উপস্থিত হয়ে নেতাদের অনর্থ ভাষণ শুনে যেতে হয়। অমৃতাভরা চাক বা না-চাক মানুষের সম্পর্ক থেকেই জন্ম দাসত্বের। কারণ ব্যক্তিগত ইচ্ছা বা অনিচ্ছার দমনই হলো সম্পর্কের শর্ত। দাসত্ব ও দমনের কথায় চলে আসে কারাগারের কথা। কারাগার অর্থ আইনসভা অর্থ সংবিধান অর্থ নির্বাচন অর্থ ব্যালট-বুলেট-রিগিং অর্থ দারিদ্র্য-ক্ষুধা-বেকারি অর্থ খরা-বন্যা-দাঙ্গা-উদ্‌বাস্তু অর্থ যুদ্ধ-বোমা-আতঙ্ক। হিংসা আর ভয়ের সন্ত্রাস। অতএব সরকার ওরফে মন্ত্রী ওরফে সংবিধান-সংশোধন ওরফে আইন ওরফে থানা-পুলিশ-জেলখানা। এই বৃত্তায়ন মানুষেরই জন্য, মানুষের সভ্যতার জন্য। এই বৃত্তই প্রসারিত হয়ে চলেছে নতুন ও পুরোনো সব সংগঠনে— ধর্ম, মানবাধিকার, সংস্কৃতি, পলিটিক্স, কমিশন, এনজিও, পার্টি, ফ্র্যাকশন, গোষ্ঠী, রাষ্ট্রসংঘ প্রভৃতি ও ইত্যাদি। দাসত্ব আর বিবেকের পরস্পরের মধ্যেও কি বাঁধন আছে কোনো? অমৃতাভ বা আরো যে কোটি কোটি মানুষ জেলখানার বাইরের জীবন নিয়ে প্রতিদিন বাঁচে তারা কি তাদের অভ্যাসের থেকে মুক্ত? অভ্যাস আছে বলেই কি মানুষের মুক্তির পৃথিবীতে, আকাশ-মাটি-জল-আলো-বাতাসের পৃথিবীতে দাসত্ব মেনে ঘুরে বেড়ায় তারা? ঘুরে কি সত্যি বেড়ায়? কেননা সেও তো নিয়ন্ত্রিত এক প্রথা-ভ্রাম্যমাণতা। যাওয়া এবং ফিরে আসা। ঘরের থেকে বাইরের টানে। আবার বাইরেকে টেনে ঘরের ভিতর।

## কী এক বিপন্ন কী বিরোধাভাস শুধু

কলেজস্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলেছে অমৃতাভ। পরমার্থ-দ্বিজেশ-শৌনকরা একটা বইয়ের দোকানে প্রতি শনিবারের বিকেলে আড্ডায় এসে বসে। সেও মাসে-দু'মাসে এখানে এলে ঢুকে পড়ে সেই আড্ডায়। দোকানের মালিক বারীনদা। অকৃতদার, চল্লিশোর্ধ্ব মসৃণ চেহারা। দ্বিজেশের দূরসম্পর্কের দাদা, মজলিশি মেজাজে অকৃপণ, কৃত্রিমতা-বর্জিত। এই আড্ডার মধ্যমণি বারীনদাই, যদিও কথা বলেন কম। বই পড়তে নিজে যত ভালোবাসেন, অন্যদের পড়িয়েও আনন্দ পান তত। পরমার্থ, দ্বিজেশ, শৌনক প্রত্যেকেই অমৃতাভর নিকট বন্ধু, কিন্তু এই গল্পের আসরে সে আসে বারীনদার টানে। তাছাড়া বইয়ের একটা আকর্ষণ তো রয়েছেই। বহু দিন, বহু বহু দিন এই বইপাড়ায় এ-দোকানে সে-দোকানে এ-বই সে-বইয়ের পাতায় চোখ বোলাতে বোলাতে তিন-চার ঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দিয়েছে সে। প্রতিটি বইয়ের মলাট, কাগজ, অক্ষর, সদ্য ছাপার গন্ধ— সবকিছু এত প্রিয় যে, বইগুলোকে ধরে আদর করতে ইচ্ছা করে। প্রত্যেক বইয়ের পিছনে যে-শ্রম, তাকে কুরনিশ জানাতে ইচ্ছা করে। কোনো কোনো দিন বই কিনে হয়তো ঢুকে পড়ে কফিহাউসে। এক কোণে বসে লক্ষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি, মেডিকেল কলেজ, সংস্কৃত কলেজ কিংবা আশেপাশের অন্যান্য কলেজ থেকে আসা ছাত্রছাত্রীদের। ওদের চলন, কথা-বলা, পোশাক-আশাক থেকে সময়কে বোঝার চেষ্টা করে। ওদের প্রাণোচ্ছল হাসি আর উদ্দামতায় নিজেকে দূর থেকে সঁপে দিয়ে আনন্দ পায়। এখানকার কোনো কলেজে সে পড়েনি। তার বিদ্যালাভ মফস্‌সলের শান্ত পরিবেশে। তাই এই উদ্‌বেল জীবনকে অনুভব করার লোভে এক কাপ কফির পেয়ালায় সে কত কত দিন নীরব হয়ে বসে থেকেছে। রংবেরঙের মেয়ে বা তাদের অবিন্যস্ত, বাউন্ডুলে ছেলেবন্ধুদের সঙ্গে তারও শ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে দেয়ালে দেয়ালে, চেয়ার-টেবিলে, কফির-কাপে, সিগারেটের ধোঁয়ায়। তারপর সন্ধে হলে, লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনের লোকজনেরা, নামী-অনামী কবি-লেখকেরা দল বেঁধে এসে ভিড় জমায়। তাদের মাঝখানেও অমৃতাভ চুপ করে বসে থাকতে ভালোবাসে। এই-যে এদের কারো কাছে সে কেউ নয়, সেই কেউ-না পরিচয় নিয়ে তার অভিমান হয়, দুঃখ হয়, আবার একটা তৃপ্তির আবেশও উপলব্ধ হয় যেন। কখনো-বা নির্জন দুপুরে কলেজস্কোয়ারের জলাধারে ফুটপাথের ন্যাংটো ছেলেমেয়েদের অবিরাম সাঁতার ও ঝাঁপ-দেওয়া দেখতে দেখতে কোনো-এক বেঞ্চের নিবিড়তায় এলিয়ে পড়তে ভালো লাগে খুব। আশেপাশের গর্ত থেকে দু-একটা মেঠো ইঁদুর বেরিয়ে অমৃতাভকে দেখে আবার দৌড়ে চলে যায় গর্তে। ইঁদুরের সেই আসা-যাওয়ার ভিতর কেন জানি এক প্রীতির অনুভূতি টের পায়।

আজ যখন অমৃতাভ বারীনদার দোকানে পৌঁছাল, আড্ডা পুরোদস্তুর জমে উঠেছে। পরমার্থ বলছিল, "আমার স্থির বিশ্বাস অনেক কিছুর মতো বইটাও বাঙালির হুজুগ। কলকাতায় বইমেলা তাই টপ হিট।" শৌনক পরমার্থর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "বইমেলা আর পুজোপার্বণে আমি তো বিশেষ পার্থক্য দেখি না। হয়তো কয়েক বছর পর দেখব বইমেলা উপলক্ষে দোকানে দোকানে জামাকাপড় কেনার হিড়িক লেগে গেছে!" দ্বিজেশ বিরোধিতা করে বলল, "এ কিন্তু তোদের বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। বাঙালি হুজুগে একথা ঠিক। কিন্তু বই যদি হুজুগের অংশ হয় তাতে ক্ষতি কি? ভালো জিনিসের হুজুগও ভালো। তাই আমার মতে, বইমেলা যদি হুজুগ হয়, তাকে সকলের স্বাগত জানানোই উচিত।" বারীনদা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফুট কাটল, "হুজুগটা কিন্তু বিদেশি সাহিত্য আর সাহিত্যের বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠা ঘিরেই। এই বাংলায় তরুণ প্রতিভাবান লেখকরা আজও গাঁটের কড়ি খরচা করেই বই ছাপায়; আর সে-বইয়ের কোনো বিক্রেতা নেই, ক্রেতা তো দূরস্থ! সৌজন্যসংখ্যায় বিলোতে হয় সেইসব। তবু অধিকাংশ পাঠকই তা পড়ে না। সামান্য উলটে পালটে রেখে দেয়। যারা পড়ে, তারা মন্তব্য করে না। যারা প্রতিষ্ঠিত, তারা সন্তর্পণে আলোচনা এড়িয়ে যায়। কিন্তু এদেরই মধ্যে যখন কেউ কেউ হঠাৎ গুরুত্ব পেয়ে যায় বড়ো হাউসের কাছে, তখন তার সবচেয়ে ট্যাঁশ লেখার বাজারদরও ততোধিক। এ-বঙ্গদেশে প্রতিভাবানেরা চিরকাল উপেক্ষা সহ্য করেছেন, সে বিভূতিভূষণই হোন বা মানিক বা জীবনানন্দ। এমনকি রবীন্দ্রনাথও।" "রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল কিন্তু তাদের জীবদ্দশাতে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন", পরমার্থর এই কথায় শৌনকের সংযোজন, "খ্যাতির বিড়ম্বনাও।" "খ্যাতিই হোক বা বিড়ম্বনা, সবের পিছনে কিন্তু প্রতিষ্ঠান।" বারীনদাকে সমর্থন করে দ্বিজেশ বলল, "প্রতিষ্ঠানকে অস্বীকার করে সাধ্য কার? মার্কসকেও নাকি বলতে হয়েছিল, কী বাঁচোয়া, আমি মার্কসবাদী নই।"

"বারীনদা, তোমাদের এই প্রতিষ্ঠান, না-প্রতিষ্ঠান তর্কের কোনো মীমাংসা আছে কি? তার চেয়ে কোনো নতুন খবর শোনাও। একেবারে টাটকা।" অমৃতাভ প্রসঙ্গ

পালটাতে চাইল।

বারীনদা: নতুন খবর তো শোনাবি তুই। তোর কবিতার বই বেরুল! কোথাও আলোচনা বেরিয়েছে?

অমৃতাভ: জানি না।

বারীনদা: সব কাগজে বই জমা করেছিস তো?

অমৃতাভ: তা মোটামুটি করেছি। তবে মনে হয় না কিছু লিখবে। চারিদিকে এত কবি; কবিতার বই। আসলে ওদের সঙ্গে লেগে থাকতে হয়। পরিচয় জমাতে হয়। আমার পক্ষে সেসব সম্ভব না।

শৌনক: তাহলে বই বের করা কেন বাপু?

অমৃতাভ: লিখতে লিখতে পড়তে পড়তে কবিতাগুলোর প্রেমে পড়ে গেলাম যে! মনে হলো ছাপার অক্ষরে সে-প্রেম টেকসই হবে।

পরমার্থ: হয়েছে কী?

অমৃতাভ: আলবাত। না-হলে তোরা কেন ভাবছিস আমার কবিতা নিয়ে? বই রয়েছে বলেই না? আচ্ছা বারীনদা, তোমার এখানে তো অনেকে আসেন, বইটা উলটে-পালটে দেখেছেন কি কেউ?

বারীনদা: তা দেখেছে। কয়েকজনকে তো গছিয়েও দিয়েছি।

অমৃতাভ: কোনো প্রতিক্রিয়া?

বারীনদা: এই কৃপণ সময়ে কি কেউ প্রতিক্রিয়া জানায়? চেপে ধরায় 'ভালোই তো' গোছের দায়সারা উত্তর। তবে হ্যাঁ, একজন মাঝবয়সি ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ এসে বললেন, 'দাদা এই লেখকের সঙ্গে দেখা করা যায়?' আমি 'কেন' জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন 'আমার শ্রদ্ধা জানাতাম'।

দ্বিজেশ: তোর কবিতার একটা অন্য দর্শন, অন্বেষণ আছে ঠিকই, কিন্তু অনেক কিছুই বুঝে উঠতে পারি না। আমাদের জন্য দু-একটা সহজ করে লেখ্ না অমৃত।

পরমার্থ: সহজ কথা লিখতে আমায় কহ যে, সহজ কথা যায় না লেখা সহজে। কিছু কথা না-বোঝা হয়ে থাক না। জীবনের সব কিছু কি বোঝা যায় রে দ্বিজেশ? তাছাড়া বুঝতে গেলে মনটাকে তৈরি করতে হয়, পরিশ্রম করতে হয়। কবিতার যিনি পাঠক তার পরিশ্রম একটু বেশিই। তুই কি পারবি?

দ্বিজেশ: এই তোর রোগ পরমার্থ! সুযোগ পেয়েছিস আর বক্তৃতা ছোটাতে লেগেছিস। অমৃতাভর বেশ কিছু লেখা কি অবোধ্য নয়?

পরমার্থ: থিয়োরি অব রিলেটিভিটি পড়েছিস?

দ্বিজেশ: না । আমার সাবজেক্ট ছিল হিস্ট্রি।



পরমার্থ: রিলেটিভিটিও তো এক ইতিহাস। আইনস্টাইনের বিখ্যাত সেই আবিষ্কারের মর্ম বোঝাতে তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী পাতার পর পাতা লিখে গেছেন, তবুও দুর্বোধ্যই থেকে গেছে তা। তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, নিজেরাই ঠিক ঠিক বুঝেছেন কি-না।

দ্বিজেশ: কবিতার সঙ্গে রিলেটিভিটির তুলনা! নাঃ, বিজ্ঞান পড়ে পড়ে মাথাটা তোর গেছে। শোন, অমৃতাভকে আমি আমার অভিমত জানিয়েছিলাম। এখন অবোধ্য কথাটা ফিরিয়ে নিচ্ছি। খুশি?

পরমার্থ (হেসে): তোর অভিমতের গুরুত্ব কী। বিগ হাউস, বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকেরা কী বলছেন সেটাই জরুরি। তারা যদি বলে, চলবে। তো চলল। আমাদের সাদামাটা অমৃতাভও তখন হয়ে যাবে 'প্রখ্যাত কবি অমৃতাভ সেন'।

শৌনক: তাহলে স্বীকার করছিস সংগঠনের জোরের কাছে শিল্পের সত্যও দুর্বল। স্নেহ-প্রেম-প্রীতি-প্রশ্রয়— এইসব একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতিগুলোও তো প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে যাচ্ছে ক্রমাগত। নয় কি?

পরমার্থ: অবশ্যই। প্রতিষ্ঠা ছাড়া প্রেম হয় নাকি?

দ্বিজেশ: মানে?

শৌনক: মানে খুব সোজা। আমাদিগের সম্পর্কসমূহ ইনস্টিটিউশন, সমাজ, আইনের নির্দেশে পরিচালিত। ইহাই রীতি।

দ্বিজেশ: কিন্তু গণতন্ত্র? ব্যক্তি-স্বাধীনতা?

পরমার্থ: রাষ্ট্র থাকবে আবার গণতন্ত্রও? সোনার পাথরবাটি চাস? ব্যক্তি-স্বাধীনতার জন্যই তো মানুষ পরিবার, সমাজ, সংগঠনের ভিতরে কখনো নিজেকে যুক্ত করে, আবার কখনো বিযুক্তও করে নেয়।

বারীনদা: কিন্তু ইতিহাস বলছে ইন্‌স্টিটিউশন ছাড়া, মানুষের গোষ্ঠী ছাড়া সভ্যতা এত দূর এগোতেই পারত না।

অমৃতাভ এতক্ষণ চুপ করেই ছিল। এইবারে বলল, "কী জান বারীনদা, যে-সংগঠন যত গণতান্ত্রিক, মানবমুখী, প্রয়োগবাদী, সেই সংগঠন তত প্রসার পেয়ে এসেছে। গণতন্ত্রের মূল্যবোধ ছাড়া সংগঠন বাড়তে পারে না। সমস্যা হলো, গণতান্ত্রিক বোধ বা প্রতিরোধ থেকে যার জন্ম ও বিকাশ, তা ধীরে ধীরে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আমলাতন্ত্রে পরিণত হয়। প্র্যাক্টিস দেখিয়ে দিয়েছে আজ পর্যন্ত এই সংক্রমণ থেকে মুক্ত হতে পারেনি কোনো দল বা ইন্‌স্টিটিউশন। পরিণামে আমরা দেখে আসছি, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে লড়াই, ব্যক্তির সঙ্গে সংগঠনের সংঘাত, মতাদর্শের বিরুদ্ধে ব্যক্তিত্বের জেহাদ।"

হয়তো আরো কিছু বলত অমৃতাভ, কিন্তু হঠাৎ একদল যুবক হই হই করে ছুটে এল। বিশাল শব্দে একটা বোমা পড়ল কাছে। নিমেষে ফাঁকা হয়ে গেল চারদিক।

ঝপাঝপ দোকানের ঝাঁপ পড়তে থাকল। অমৃতাভরা কী করবে বুঝতে-না-বুঝতেই সেই যুবকের দল হামলে পড়ল: "এই-যে ইন্টেলেক্চুয়াল দাদারা, চটপট দোকান বন্ধ করুন দেখি!" বারীনদা জিজ্ঞাসা করল, "কেন ভাই, কী হয়েছে?" "পুলিশ আমাদের সুব্রতদাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে, তারই প্রতিবাদে বন্‌ধ্।" "শাবাশ! মুক্তিপণের পথ মন্দ নয়। চালিয়ে যান আপনারা। এই আমি দোকান বন্ধ করছি।" বারীনদার সরস মন্তব্য।

ছেলেগুলো বেরিয়ে গেল। দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে বারীনদা বলল, "গণতন্ত্র আর সংগঠনের কী দারুণ রাজযোটক দেখলি অমৃত! ঘটনা কী জানিস, এরা পুজোর চাঁদা আদায় নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় জুলুম চালাচ্ছিল। প্রকাশক ও পুস্তকবিক্রেতা সংগঠনের পক্ষ থেকে থানায় নালিশ করা হয়। কয়েকজনের নাম দিয়ে এফআইআর-ও করা হয়। সুব্রত যাদের একজন। সে গ্রেপ্তার হতেই এরা প্রতিবাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বোমা নিয়ে। বন্‌ধ্ করে, জনজীবন বিপর্যস্ত করে দাবি আদায় করবে বলে। গণতন্ত্র তো দুটোই— আমাদের এফআইআর এবং ওদের বোমা!"

আবার বোমা পড়ল। এবার একেবারে দোকানের সামনেই। এতক্ষণ বেশ ছিল অমৃতাভ। গল্পে, তর্কে মশগুল। কোথাও যাবার কথা মনেও হয়নি। কিন্তু এখন নিজেকে ভীষণ বন্দি মনে হলো। সারি সারি বইয়ের দোকান আর লক্ষ লক্ষ বইয়ের ব্যূহের মধ্যে এইটুকু সময়েই হাঁপিয়ে উঠল মন। এইভাবে আটকে পড়াতে তার এত বিরক্ত লাগছিল যে, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ফস্ করে সেই আলোবাতাসহীন দোকানঘরের মধ্যে ধূমপান উচিত নয় জেনেও সিগারেট ধরাল সে। বারীনদা অমৃতাভর অবস্থা আন্দাজ করে বলল, "এরই নাম স্বাধীনতা অমৃত! নিজে তুমি যতই স্বাধীনচেতা হও-না-কেন সমবেত গুন্ডামির কাছে পরাধীন। যত দুর্জয় সাহসই থাকুক, বোমার স্প্লিন্টারের কাছে তা দুর্বল। অতএব এই কারাগার শিরোধার্য করে 'আরো একটু বোসো তুমি আরো একটু বলো'। আচ্ছা থাক্, মনে হচ্ছে আড্ডা আর জমবে না, বরং তাস খেলা যাক।"

বারীনদা, পরমার্থ, শৌনক, দ্বিজেশ বসে গেল তাস খেলতে। অমৃতাভ দু-একটা দান দেখবার পর একটা বই টেনে নিল হাতে। আন্দ্রেই তারকোভ্স্কির ডায়রির বাংলা অনুবাদ। তারকোভ্স্কির ফিল্‌মের ভক্ত সে। অল্পক্ষণের মধ্যেই মজে গেল সেই বইয়ে। তারপর কতক্ষণ কেটে গেছে টের পায়নি। একে একে চারপাশের বইয়ের দোকানের ঝাঁপ খুলতে শুরু করেছে। রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা। সে ঘড়ি দেখল। সন্ধে সাতটা। বারীনদা তাস গোছাতে গোছাতে বলল, "চল্, বেরুনো যাক। মনে হচ্ছে গোলমাল মিটে গেছে। আমি আজ আর দোকান খুলছি না। সমবেত মস্তানির প্রতিবাদে এ হলো আমার ব্যক্তিগত বন্‌ধ্-পালন।"



পাঁচজন একসঙ্গে শিয়ালদহ পর্যন্ত এল। সেখান থেকে বারীনদা চলে গেল সিঁথির বাস ধরবে বলে। পরমার্থ থাকে বেলেঘাটা। ও দ্বিজেশের সঙ্গে হাঁটা দিল সাউথ সেকশনের দিকে। দ্বিজেশ যাবে যাদবপুর। শৌনকের সঙ্গে অমৃতাভ পা বাড়াল নর্থের দিকে। শৌনক বারাসাতের ছেলে। দুজনে শিয়ালদহে ঢুকেই নিজেদের ট্রেন পেয়ে গেল। নৈহাটি লোকালে, কী আশ্চর্য, অমৃতাভ বসার জায়গাও পেয়ে গেল। চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে এমনই আর-এক সন্ত্রস্ত দিনের কথা মনে পড়ল তার।

সেদিন মৌমির সঙ্গে দেখা করবে বলে ইউনিভার্সিটির বিপরীতে ছোট্ট রাধাচূড়া গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিল। চৈত্রের ঝাঁঝালো রোদ এসে পড়েছে মুখে। গরমে দাঁড়ানো অসহ্য হয়ে উঠেছে, তবু অপেক্ষা করছিল। প্রায় মিনিট চল্লিশ প্রতীক্ষার পর উলটো দিকে ইউনিভার্সিটির গেট থেকে মৌমিকে বেরিয়ে আসতে দেখল। ঠিক সেই মুহূর্তে, সবে ওদের চোখাচোখি হয়েছে এমন সময়, সবাইকে সচকিত করে ট্রামলাইনের উপর পর পর দুটো বোমা পড়ল। ঘটনার আকস্মিকতায়, বোমার শব্দে আর ধোঁয়ায় হতভম্ব হয়ে গেল অমৃতাভ। মৌমির কথা ভেবে সে ইউনিভার্সিটির দিকে এগোতে গেল, কিন্তু কে একজন জামা টেনে ধরল। কিছু বলার বা করার আগেই টান মেরে তাকে একটা দোকানে ঢুকিয়ে ঝাঁপ ফেলতে ফেলতে বলল, "মরবার সাধ হয়েছে নাকি দাদা?" অমৃতাভ দেখল তারই সমবয়সি ছেলে। দোকানের মালিক বা কর্মচারী হবে। "ধন্যবাদ আপনাকে, কিন্তু ইউনিভার্সিটির গেটে আমার এক বান্ধবী ছিল।" তাকে আশ্বস্ত করে ছেলেটি বলল, "ইউনিভার্সিটির ভিতর কিসস্যু হবে না। যত লড়াই এই রাস্তা জুড়ে।" কথা শেষ হতে-না-হতেই মুড়িমুড়কির মতো বোমা পড়তে থাকল আর, অনর্গল খিস্তিখেউড়, স্লোগান, চিৎকার। কেবলই দুশ্চিন্তা হচ্ছিল— মৌমি ঠিকঠাক ঢুকে পড়েছে তো ইউনিভার্সিটির নিরাপদ আশ্রয়ে?

অল্পক্ষণের মধ্যেই পুলিশ এসে সমস্ত চত্বর ব্যারিকেড করে দাঁড়াল। আধঘণ্টার ভিতর পরিস্থিতি অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। একটা ফাঁকা ট্রাম ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে কলেজস্ট্রিটের দিক থেকে বৌবাজারের অভিমুখে চলে গেল। একদল ছাত্র দু-হাত মাথার উপর তুলে ইউনিভার্সিটির থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে রাধাচূড়ার তলায় বাস ধরবে বলে এসে দাঁড়াল। অমৃতাভও দোকানের থেকে বেরিয়ে ওদের উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল, "কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি তো?"

"না।" উত্তর দিল একজন।

"এত বোমাবাজি কেন?" বেলাগাম প্রশ্নটা করেই ফেলল অমৃতাভ।

"আপনি ইউনিভার্সিটির ছাত্র নন?" একজন জানতে চাইল।

"না, কিন্তু কেন বলুন তো?"

"তাই বলুন। আগামীকাল ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদের নির্বাচন। তার আগে দু-দলের শক্তির মহড়া চলছে। একদল চায় বানচাল হোক। অন্য দল ভোট করাবেই।"

"আপনারা ভোট দেন? ভয় করে না?"

"ভোট দিই বলেই কোনো ভয় নেই আমাদের।"

"এই বোমাতন্ত্র, খিস্তিতন্ত্রের কোন্ দিকে আপনারা?"

"বোমাতন্ত্র বা খিস্তিতন্ত্র নিয়ে কোনো মাথাব্যথা নেই আমাদের। নির্বাচনতন্ত্র ভালোয় ভালোয় পার হয়ে গেলেই হলো। কারণ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো নির্বাচন হওয়া মানেই চোখ বুজে বলে দেওয়া যায় কাদের জয় হবে।"

"জেতা যখন নিশ্চিত, তখন বোমাবাজি কেন?"

"বাঃ, ওরা বোমা মারবে আর আমরা ওদের রসোগোল্লা দিয়ে আদর করব?"

বোঝা গেল এরা জয়ী শিবিরেরই লোকজন। অমৃতাভ আর কথা না বাড়িয়ে ওদের নমস্কার করে পা বাড়াল রাস্তায়। সমস্বরে হাঁ হাঁ করে উঠল ওরা, "করছেন কী? ছাত্র ছাড়া অন্যদের দেখলেই পুলিশ জিপে তুলে লালবাজার-বউবাজার থানায় চালান করে দিচ্ছে। আমরা আমহার্স্টস্ট্রিট যাব। আপনি?"

"আমি শিয়ালদহ।"

"চলুন, আপনাকে সূর্যসেনস্ট্রিটের মুখ পর্যন্ত এগিয়ে দিই। ওখানে পৌঁছুতে পারলে আর ভাবনা নেই।"

মনে মনে অমৃতাভ ভাবল, বাঃ বেশ মজা তো! সে-যে বোমাতন্ত্রে নেই সেকথা প্রমাণ করতে তাকে কি-না বোমাতান্ত্রিকদের সঙ্গেই হেঁটে যেতে হবে এখন! এই না-হলে গণতন্ত্র? ব্যক্তিস্বতন্ত্রতা?

হৃদয়ের সমস্ত বিরুদ্ধতা, যন্ত্রণা নিয়েও সে ওদের সঙ্গে হেঁটে এসেছিল আমহার্স্টস্ট্রিট-সূর্যসেনস্ট্রিট ক্রসিং পর্যন্ত। তারপর ধন্যবাদ জানিয়ে চলে গিয়েছিল শিয়ালদহ স্টেশনে।

এর প্রায় একমাস পরে কিছু সময়ের জন্য দেখা হয়েছিল মৌমির সঙ্গে; কলেজস্ট্রিটেই। জিজ্ঞাসা করেছিল অমৃতাভ, "তুমি তো ছাত্র রাজনীতি করো, সংসদের নির্বাচন নিয়ে যে দলাদলি, গুন্ডামি, সন্ত্রাস— তার প্রতিবাদ কর না কেন?"

"প্রতিবাদ করতেই তো আমাদের দলও পালটা বোমা মেরেছিল!"

"আমি সেই প্রতিবাদের কথা বলছি না। বলছি তোমরাও যে তৈরি করছ পালটা সন্ত্রাস, তার প্রতিবাদ কর না তুমি?"

"পালটা সন্ত্রাস হবে কেন? আমাকে মার লাগাবে আর আমি তোমাকে



ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো করব?"

"তবু এসব ঘটনায় নিজেকে অসহায় লাগে না তোমার?"

"না। লাগে না। নিজেকে দলের সঙ্গে যুক্ত করলে দেখবে, সব ঠিকঠাকই আছে। তুমি যখন দল করতে তখন কি মনে হতো এতসব?"

"হয়তো তেমন গভীরভাবে হতো না, কিন্তু তবু কেন জানি মনের ভিতর অস্বস্তি হতো। মানিয়ে নিতে কষ্ট হতো। কথা আর কাজের মধ্যে এত ফারাক! একটা দমবন্ধ শূন্যতা চেপে ধরত আমাকে।"

"সময়কে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করো অমৃত। নইলে নিজে তো কষ্ট পাবেই, অন্যদেরও কষ্ট দেবে তুমি।"

"তুমি কষ্ট পাও? ওই দিন আমার কথা ভেবে কষ্ট হয়েছিল তোমার?"

"সেই দিন ঠিক কষ্ট নয়, তবে দুশ্চিন্তা হয়েছিল খুব।"

"তাহলে এই একমাস একবারও খোঁজ নাওনি কেন?"

"কে বলল নিইনি? মুনমুনকে জিজ্ঞাসা কোরো। ও-ই তো বলল, শুভাশিসরা তোমাকে আমহার্স্টস্ট্রিট পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছিল!"

মনে পড়ল অমৃতাভর, মুনমুন পরের দিন বাড়িতে এসে খোঁজ নিয়েছিল তার। মুনমুন রায়। মৌমির সহপাঠী। সোদপুরে বাড়ি। একদিন মৌমিই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। যখন-তখন চলে আসত বাড়িতে। উচ্ছল। চঞ্চল। কতবার জোর করে নিয়ে গেছে ওদের বাড়িতে। আলাপ করিয়ে দিয়েছে বাবা-মার সঙ্গে 'মৌমির প্রেমিক' পরিচয়ে। ওদের বাড়ির বিপুল বৈভবের মধ্যে বসে থাকতে থাকতে অমৃতাভ দেখেছে সর্বত্র কী অপচয়! অনেকসময় মুনমুনকেও মনে হতো অপচয়। না-হলে অত সহজে কোনো মেয়ে কি পারে তার শরীর তারই সহপাঠিনীর প্রেমিকের কাছে হাট খুলে দিতে?

"তোমার লজ্জা করে না মুনমুন?"

"কিসের লজ্জা?"

"এরকম আলগা হয়ে যেতে?"

"দেহ নিয়ে আমার সংস্কার নেই কোনো।"

"ভয়?"

"কিসের ভয়? অন্যায় করলে তবে মানুষ ভয় পায়। শরীরকে ভালো-লাগার মধ্যে অন্যায়টা কোথায়? নিজের শরীর থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পেরে বরং আনন্দ হয় আমার।"

"কিন্তু ভালোবাসা ছাড়া—"

"ভালোবাসা? বেশ, তুমি তো আমাকে ভালোবাসো না, তবু আমাকে ছুঁয়ে কি আনন্দ হয় না তোমার?"

"না। শুধুই শিহরন। তীব্র জ্বরে যেন পুড়ে যাই আমি। ভয়ংকর নেশায় বুঁদ হয়ে যাই। তোমার কি কাউকে ভালোবাসতেও ইচ্ছে করে না মুনমুন?"

"করে। কিন্তু, বাড়ির কাছে আরশিনগর, এক পড়শি বসত করে / আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।"

"খোঁজো। খোঁজার মতো খোঁজো। আমাকে ছেড়ে দাও।"

"ছাড়িব না, ছাড়িব না" বলে সুর করে করে হাসতে থাকে মুনমুন। নিজের দামি পোশাক সজোরে ছিঁড়ে ফেলে। অপচয়। অমৃতাভকে টেনে নেয় বুকের ভিতর। অপচয়। উড়িয়ে দেয় ছেঁড়া পোশাকের টুকরো। অপচয়। অর্ধনগ্ন শুয়ে পড়ে বিছানায়। অপচয়।

অমৃতাভ দেখতে থাকে একটা ব্যাঙ হাত-পা ছড়িয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। সে কি তবে এখন ছুরি-কাঁচি নিয়ে এগিয়ে যাবে? ব্যবচ্ছেদ করে পাঠ নেবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের? তারপর— হয়তো ধমনী-শিরা-অন্ত্র-নালিকা কাটতে কাটতে ঘুলিয়ে উঠবে শরীর! আর এইভাবে প্রতিটি পাঠের শেষে মাথায় তীব্র ক্ষরণ ঘটতে থাকবে; চেতনা হারিয়ে ফেলবে সে।

মৌমিকে বলল, "হ্যাঁ মুনমুন খোঁজ নিয়েছিল বটে, কিন্তু তোমার কথা বলেনি একবারও।"

অমৃতাভ দেখল, চুপ করে আছে মৌমি। বিদায় নেবার সময় হলো কি তবে? আরো কিছুক্ষণের নীরবতার পর ওরা পরস্পর বিদায় নিয়ে চলে গেল নিজের নিজের সময়, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্নের ভিতর।

**স্বপ্ন/সময়**

সময়ের গভীরে কত কল্পনাই-না ঘুরে বেড়ায়! ধরাছোঁয়ার বাইরের সেই-সব কল্পনা এমন এক-একটা মুহূর্ত নিয়ে আসে, মনে হয়, চারপাশের দুনিয়াটা একেবারে আলাদা। আকাশ, বাতাস, মাটি, গাছপালা— সবের মধ্যে লুটোপুটি খেতে থাকে একা অমৃতাভ। তার চোখ থেকে যেন আলোরশ্মি বেরিয়ে এসে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আনাচেকানাচে ঘুরে বেড়াতে থাকে। দেখে, সেখানে অনেক-সব ছায়া হেঁটে বেড়ায়, কথা বলে কানে কানে, আর তারপর, গড়িয়ে যায় জলের নীচে। সেইসব অগণন ছায়া ধীরে ধীরে তার ছোট্ট ছায়াটিকে জড়িয়ে ধরে এক-একটা গাছ হয়ে উঠছে যেন। বিশাল এক বনানী হয়ে উঠছে ক্রমশ। এইসব দেখা কি তবে স্বপ্ন? স্বপ্নই যদি, সে হাঁটছে কী করে? শরীরে অনুভূত হচ্ছে স্পর্শ? অমৃতাভ তো তার দৃষ্টি, ঘ্রাণ, শ্রবণ সমস্ত নিয়েই এই সময়ের মধ্যে রয়েছে! তবে কি মরীচিকা সবই? স্বপ্নবিকার?

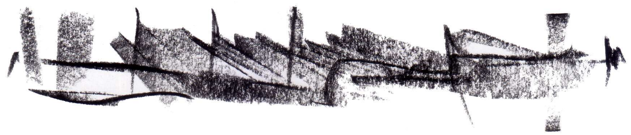

## সভা ছেড়ে যায় সংঘ, সংঘারামে মাছি

ইউনিয়নের বার্ষিক সাধারণ সভার কাজ চলেছে। অমৃতাভও যোগ দিয়েছে। নেতারা একে একে বক্তৃতামঞ্চে উঠে তাদের বক্তব্য বলছেন। শ্রোতাদের কেউ শুনছেন, কেউ-বা সভা পরিচালনায় সাহায্য করছেন, কেউ কেউ আবার নিজেদের মধ্যে কথা-বলাবলিতে ব্যস্ত। সভায় উপস্থিত সভ্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। সমগ্র সদস্যসংখ্যার কুড়ি কি পঁচিশ ভাগ হাজির হয়েছেন হয়তো। সভা-সমিতিতে ইদানীং সভ্যরা খুবই কম আসছেন। নেতাদের একঘেয়ে কথা, একপেশে চিন্তা, দূরদেশদর্শিতার বদলে একদেশদর্শিতা, আন্দোলনের গতানুগতিকতা আর সংগঠন পরিচালনায় আমলাতান্ত্রিক ঝোঁক— অমৃতাভর ধারণায় এইগুলোই সাধারণ সভ্যদের ক্রমশ সংগঠনবিমুখ করে তুলেছে। তাছাড়া সারা বিশ্ব জুড়ে ভোগ্যপণ্য ও বাজারি ব্যাপারস্যাপার, রাজনীতির অবক্ষয়, দেশে দেশে সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতা, এমনকি সোভিয়েত রাশিয়ার পতন ও টুকরো টুকরো হয়ে-যাওয়া— সবকিছু মিলেমিশে আদর্শ ও নৈতিকতার চূড়ান্ত পতন মানুষকে নিঃসঙ্গ করে তুলেছে। মধ্যবিত্ত, মধ্যমেধার মানুষজন বড়ো বেশি স্থিতাবস্থায় বিশ্বাসী; তারা চায় নিরাপদ জীবন, স্ট্যাটাস সিম্বল। তবু কেন অমৃতাভরা আসে? সম্ভবত কোনো-এক তাগিদ থেকে, নিজের মধ্যে বহু যত্নে লালিত কোনো বিশ্বাস থেকে। সে কি বিশ্বাসই শুধু? নাকি আস্থাও? এই একঘেয়ে, কর্কশ অবস্থা বদলাবার প্রতি আস্থা? আর তাই ক্রমাগত সেই আস্থায় অভ্যস্ত ও আশ্বস্ত থেকে প্রতীক্ষা করে যাওয়া?

সংগঠনের সব কাজেই অংশ নেয় সে। সোজাসুজি অংশ নেয় বললে বোধহয় ভুল বলা হবে। বরং বলা ভালো, উপস্থিত থাকে। মিছিলে যায়, স্লোগান দেয়, পোস্টার লেখে, গেট-মিটিংয়ে যোগ দেয়। আবার কাজ হয়ে গেলে নিঃশব্দে সবাইকে এড়িয়ে বাড়ি ফিরে আসে।

আজকের সভায় নতুন কমিটি তৈরি হবে। ঠিক হবে আগামীদিনে সংগঠন পরিচালনায় কী কী পদ্ধতি নেওয়া জরুরি, যাতে সভ্যরা আরো বেশি বেশি সংগঠনের কাজে অংশ নিতে পারে। এখন তাই তার পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

নেতারা অবশ্য সেই পুরোনো পদ্ধতিগুলোই আউড়ে চলেছেন। এখন যিনি বক্তৃতা করছেন তিনি সৎ, উদ্যমী, পরোপকারী; কিন্তু চিন্তাভাবনা বড়োই একবগ্গা। অমৃতাভ একবার গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে ইনি নানাভাবে সাহায্য করেছিলেন। ভদ্রলোক এখন যা আউড়ে চলেছেন, তার বিন্দুবিসর্গও সমর্থন করে না সে। কথাগুলো এতই শিশুসুলভ আর অর্থহীন যে, অমৃতাভর বরং বিরক্তই লাগছিল। এত কম জ্ঞান ও বুদ্ধি নিয়েও কী করে যে ভদ্রলোক এতদিন নেতা হয়ে আছেন, সেকথা ভেবে বেশ অবাক হতে হয়। অমৃতাভ কি বলবে তাকে, ‘আপনার কথাগুলোর কোনো অর্থ নেই— একেবারেই বস্তাপচা— অসহ্য’? বলতে পারবে? ওর প্রতি কৃতজ্ঞতার একটা বোধ যেন তাকে পরাধীন করে রেখেছে। তবে কি এইরকম নির্ভরতার কারণেই সাধারণ সভ্যরা নানাভাবে নেতাদের সমর্থন করে চলে? নিরুপায়?

মনে ভাবল, তবু আজ তাকে কিছু বলতেই হবে। বলবে সংগঠনের সংস্কারের কথা। ভদ্রলোকের বক্তৃতা শেষ হতেই তাই উঠে দাঁড়াল সে। এগিয়ে গেল মাইক্রোফোনের দিকে। বলতে শুরু করল, কিভাবে সংগঠন-পরিচালনার পদ্ধতিটাকেই পালটে ফেলতে হবে আজ। কেন তা জরুরি। বলল, সংগঠনে কিভাবে গণতন্ত্রের চর্চাকে সজীব রাখতে হয়। শুধু ভোটাভুটির স্বাধীনতাই গণতন্ত্র নয়। সংগঠনের প্রতিটি সিদ্ধান্তে সদস্যদের মতামত জানাটাও গণতন্ত্র। এই সভার মতো মুষ্টিমেয় উপস্থিত ক-জন সভ্যের উপর আগে থেকে স্থির-করা কোনো মতামত নেতারা যদি বারবার চাপিয়ে দিতে থাকেন তবে সংগঠন তার গতি হারাতে বাধ্য। অধিকাংশ সভ্য যদি মিটিং-এ গরহাজিরও থাকেন, টেবিলে টেবিলে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলে তবু সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রয়োজনে গোপন ব্যালটেও জানা যেতে পারে মতামত। তারাই যে ইউনিয়নের প্রাণ, সেকথা তাদেরকে বুঝতে দিতে হবে। যত সামান্য সিদ্ধান্তই হোক-না-কেন গণতান্ত্রিক হতে হবে তাকে। গণতন্ত্রের নানান পরীক্ষানিরীক্ষাই সংগঠনকে সজীব, প্রাণবন্ত রাখে। সংগঠনকে মতের অধীন নয়, হতে হবে মুক্ত। প্রতিটি পর্যায়ে তার চর্চা হোক খোলামেলা।

অমৃতাভর সংক্ষিপ্ত ভাষণ উপস্থিত সদস্যদের দারুণ সমর্থন পেল। সেটা আন্দাজ করেই বোধহয় মঞ্চ থেকে নেমে এক নেতা তার পিঠ চাপড়ে দিয়ে গেলেন। অন্য-এক নেতা বক্তৃতায় অমৃতাভর কথা উল্লেখ করে বললেন, “আমার আজ খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, নতুন প্রজন্ম, নতুন নেতৃত্ব এগিয়ে আসছে। আমি প্রস্তাব করছি অমৃতাভকে আমাদের ছাপাখানা-সংক্রান্ত কাজের দায়িত্ব দেয়া হোক। আমার ধারণা সে এই কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারবে।” এই কথায় শ্রোতারা দ্বিগুণ হাততালি দিয়ে উঠলেন। অমৃতাভ বুঝে গেল ছাপাখানার দায়িত্ব মানে প্রুফ-দেখা, বানান-সংশোধন—



কিন্তু সম্পাদনা নয়। যত্নের ও পরিশ্রমের কাজ সন্দেহ নেই। কিন্তু তার জন্য ঘটা করে ঘোষণার দরকার ছিল না কোনো। ভুল হলো; নেতাদের দিক থেকে এই ঘোষণার যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। শ্রোতাদের কাছে নেতৃত্বকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই তো এত আয়োজনের আড়ম্বর তাদের! সভা-সম্মেলনের নামে একঘেয়ে দলতন্ত্র আর নিত্যনূতন রণকৌশল! প্রথমেই অমৃতাভকে যদি একটা মুখ্য তৎপরতার থেকে গৌণ কর্মপ্রক্রিয়ায় ব্যস্ত করে তোলা যায়, তাহলে পরবর্তীকালে ওর দিক থেকে নেতৃত্বের কোনো সংকট ঘটবে না। হাসি পেল অমৃতাভর। কারণ এঁরা জানার চেষ্টাও করেন না যে, সে নেতাই হতে চায় না। কেননা সে ভালোমতো জানে, নেতৃত্ব দেবার কাজটা অনেকদিন ধরে তার পক্ষে অনলস করে চলা কত কঠিন। অমৃতাভ ইউনিয়ন করে তার সামাজিক দায়বোধ থেকে। একাকিত্ব থেকে গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে-ওঠার তাগিদে। ভাবল, উঠে দাঁড়িয়ে বলে, সংগঠনের যে-কোনো কাজই তো এতদিন গুরুত্ব দিয়ে করে এসেছে, না-হয় কাল থেকে ছাপাখানার কাজটাও ভালোভাবে করবে; কিন্তু নেতারা কি তার দেওয়া প্রস্তাবগুলো ভালোভাবে পালন করবেন? করবেন যে না সেই সত্য বুঝতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। কারণ শুধু অমৃতাভর প্রস্তাব ছাড়া নেতৃত্ব তাদের সমস্ত প্রস্তাবই পাশ করিয়ে নিলেন। তারপর যখন সদস্যদের উপস্থিতি কমে এল, অনেকেই চলে গেছেন, তখন তারা তাদের মনোনীত কমিটির প্যানেল জমা দিলেন। সভায় যদিও অমৃতাভকে প্রশংসা করেছেন তাঁরা, কিন্তু কমিটি থেকে তার নামটা বাদই থেকে গেল! তবে কি সমবেত কোনো ভুল সিদ্ধান্তকে প্রতিরোধ করতে হলে পালটা সংগঠন চাই? দলতন্ত্র? সে কি একা কিছুই করতে পারে না? উলটে তার ইউনিয়নই কি তাকে একা করে দিতে চায়? এই কিছুক্ষণ আগে যারা তার দিকে ছিল, তারাও তো শেষমেশ বিনা প্রতিবাদে সেই প্যানেলকেই নির্বাচিত করল! অমৃতাভর কথা তো একবারও মনে এল না তাদের! ভালো। মনে মনে ভাবল সে। কারণ ওই প্যানেলে থেকেও-বা কী করতে পারত সে? ক্ষমতার বাইরের আত্মযাপনের মধ্যে নিজেকে স্থির রাখাই হয়তো ঠিক। সে যা করতে পারে, তাতেই তার মন দেয়া উচিত— বইপড়া, লেখালেখি নিয়ে থাকা। সেই-ই ভালো। বিচ্ছিন্নতার এমতো বিপর্যয় থেকে উদ্ধারের অন্য কোনো পথ যখন জানা নেই তখন বোধহয় তার আত্মমনস্ক হয়ে-ওঠা কোনো স্বার্থপরতা নয়।

সভা থেকে বেরিয়ে শহরের অসংখ্য মানুষের ভিড়ে অমৃতাভ নিজেকে ছেড়ে দিল। এই ভিড়ের ভিতরে নিজের পরিচয় গোপন করার মধ্যে এক শিহরন, এক স্বস্তি পাওয়া যায়। সেই আহ্লাদে সে ঘুরপাক খেতে থাকল পথে পথে, এক প্রান্ত থেকে অন্য-কোনো প্রান্তে। এই-যে অগণন অচেনা মানুষ, যাদের সঙ্গে কোনো পরিচয় নেই

তার, অথচ চোখাচোখি, এমনকি কথার বিনিময়, কয়েকদিনের অথবা কয়েক মুহূর্তের ব্যবধানেই অমৃতাভকে সম্পূর্ণ ভুলে যাবে তারা, আবার সাক্ষাৎ হলে চিনতেও চাইবে না। জানবে না সে জীবিত না মৃত? তার জীবন কিংবা মৃত্যুর কোনো অনুভূতিই পৌঁছাবে না এদের কাছে। তবুও ভালো লাগে সেই নাগরিক পরিচয়। নিকট পরিচিতদের কাছেই-বা তার অস্তিত্ব কতটুকু! হঠাৎ একটা কান্নার স্রোত যেন তার গলার কাছে এসে আটকে গেল। এই পৃথিবীর সমস্তের ভিতরে বেঁচে থেকেও সে কেউ না। কিছুই বদলাতে পারে না। অসহায়। সত্যি কি তবু বদলায় না কিছু? তার প্রতিদিনের কাজ, অভ্যাসের নিয়মিত যাপনচর্চা কি কিচ্ছু না? এমনকি মুহূর্ত? বা অবকাশ? এক ক্রমাগত বিচ্ছিন্ন হতে-থাকা মানুষের নিরবচ্ছিন্ন ও সংস্কৃত জীবনচর্চার সামান্য স্মৃতি কি তবু থেকে যায় না ইতিহাসের ভিতর?

এমন সময় ঝুপ করে নিভে গেল আলো। লোডশেডিং। অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে অমৃতাভর মনে হলো, আকাশভরা তারার নীচে হঠাৎ মায়াময় কোনো-এক অচেনা সময়ের ভিতরে বুঝি ঢুকে পড়েছে সে; যে-সময়ের জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই; ফাঁপা। আনন্দ হলো তার। বিশাল সেই আকাশের নীচে, নির্মল এক অনুভবে, দূরের তারাদের দেখতে দেখতে অমৃতাভ টের পেল তার সব কষ্ট, একাকিত্ব কেটে গেছে। নিজেকে সুন্দর লাগছে।

**সংগঠন**

মানুষ একা হয়েও একা থাকতে ভয় পায়। তার দরকার দল, গোষ্ঠী বা সংগঠনের। দল, সংগঠন বা গোষ্ঠীর ভিতরে সে বেঁচে থাকে, আবার তার সঙ্গে বিরোধও কম নয়। সংগঠন তাই সবসময় আলোড়িত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চেহারা বদলে যায় বলেই তাকে মনে হয় বেগবান। মানুষের চিন্তা, মতামত সংগঠনের প্রাণশক্তি। এই চিন্তা বা মতাদর্শ একঘেয়ে হয়ে গেলে সংগঠন তার গতি হারিয়ে ফেলে। ইউনিয়নের কাজেকর্মে অমৃতাভ আজ সেই স্থবিরতা দেখতে পেয়েছে। মনে হয়েছে প্রতিবাদে ফেটে পড়ে সে। কিন্তু দমন করেছে নিজেকে। কেন? সংগঠিত উপেক্ষা ও আক্রমণের ভয়? নেতৃত্বের একঘেয়ে মতাদর্শের ভয়? নিজেকে এত অসহায় লাগে, কী করবে বুঝতে পারে না। তাই কি ক্রমাগত একাই হয়ে যাবে সে? ইউনিয়নের ভিতরে থেকেও সন্ত্রস্ত আর একা ক্রমাগত... অস্তিত্বশূন্য... বিসদৃশ... ফালতু...

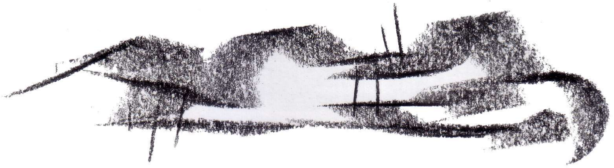

## এ যেন-বা সেই শিল্প, রক্তমাংসের

আজ মৌমির সঙ্গে দেখা করার কোনো কথা ছিল না। কিন্তু ডানলপ আসতেই অমৃতাভ হুড়মুড়িয়ে নেমে পড়ল বাস থেকে। গ্রীষ্মের দুপুর। পথঘাট নিঝ্‌ঝুম। ধীরে পায়ে হাঁটতে হাঁটতে মৌমিদের বাড়ির সামনের পুকুরপাড়ে এসে খুব সাঁতার কাটার ইচ্ছা হলো তার। জলের দিকে তাকিয়ে রইল সে। একটি বউ স্নান করছিল। চোখ পড়তেই বউটি ওর শাড়ি সামলানোর চেষ্টা করল। লজ্জা পেল অমৃতাভ । দ্রুত দৃষ্টি ফিরিয়ে মৌমিদের বাড়ির দিকে তাকাল। ইতস্তত ভাব নিয়ে এগুতে থাকল সেদিকে। এই ভরদুপুরে বিনা কারণে মৌমিদের বাড়িতে যাওয়া কি ঠিক হবে? কী ভাববেন মৌমির মা? হয়তো বিরক্ত হবেন। হয়তো মৌমি নেই। তখন কী করবে সে? ভাবতে ভাবতে বাড়িটাকেই পেরিয়ে গেল অমৃতাভ। খেয়াল হতেই ঘুরে দাঁড়াল আর, তখনই পুকুরের বউটি ওর ভেজা শাড়িতে মুখ লুকোতে লুকোতে পেরিয়ে গেল তাকে। ওর শরীর থেকে চুঁয়ে-পড়া জলে রাস্তাটা ভিজে উঠল। সেই জলের শান্তি নিয়ে অমৃতাভ উঠে এল মৌমিদের বাড়ির দরজায়। কলিংবেলে হাত দিয়েও তার আঙুল যেন থেমে গেল।

"এত দ্বিধা কিসের?" যেন বউটি এসে দাঁড়িয়েছে পিছনে। কানে কানে জিজ্ঞাসা করছে তাকে। বউটির নির্দেশেই হয়তো বেল বাজাল অমৃতাভ। একবার। দুইবার। তিনবার। থেমে থেমে। কিন্তু কেউ আসছে না কেন? বাড়িতে কি নেই কেউ? চলে যাবে? "একটুও তর সইছে না বুঝি?" অপরিচয়ের থেকে পরিচয়ে ঢুকে পড়েছে বউটি, অনায়াসে। ভিতরের দিক থেকে দরজা খোলার শব্দ কানে এল। উন্মুক্ত বারান্দায় বেরিয়ে এল মৌমি। পিছন থেকে বউটি বলল, "এবার তবে আমি যাই!" পিছনে অনিবার্য ঘুরে তাকাল অমৃতাভ। দেখল, কেউ নেই। জলের স্নেহে পুকুরটি টলটল করছে শুধু।

"তুমি!" চাবিতে কলাপ্‌সিবল গেটের তালা খুলতে খুলতে মৌমির বিস্ময়।

"কেন? আসতে নেই বুঝি?" অমৃতাভর সমর্পিত জিজ্ঞাসা।

“তা কেন?”

“তবে?”

“এমন হুট করে তো আসো না তুমি! তার উপর আজ যা গরম!”

“হঠাৎ খুব মনে হলো তোমাকে। চলে এলাম... মা কোথায়? ঘুমুচ্ছেন?”

“না। বরানগরে কাকুর বাড়ি গেছেন। একটা অনুষ্ঠান আছে সেখানে।”

“তুমি গেলে না?”

“শরীর ভালো নেই।”

“কী হয়েছে?”

“তেমন কিছু না। সকাল থেকে মাথা ধরেছিল ভীষণ। পেট ঘোলাচ্ছিল। এখন অনেকটা ঠিক আছে।”

দুজনের কথার ফাঁকে অমৃতাভ বাইরের ঘরের সোফায় গা এলিয়ে বসল।

“ভিতরের ঘরে চলো।” মৌমি বলল।

“এখানেই তো ঠিক আছে।”

“না ঠিক নেই। এটা পশ্চিমের ঘর। বড্ড গরম। পুব-দক্ষিণের ঘরটা এর থেকে অপেক্ষাকৃত ঠান্ডা।” সুতরাং মৌমির যুক্তিগ্রাহ্য কথা মেনে সে উঠে এল।

মৌমিকে পড়ানোর কারণে বহুবার এসেছে এ-বাড়িতে, কিন্তু এই ভিতরের ঘরে তার কোনোদিন প্রবেশ ঘটেনি। তাই কি একটু অন্যরকম অনুভূতি হচ্ছে? অনুষঙ্গ বদলে গেলে মানুষও কি বদলে যায়? বাইরের-ঘরের-অমৃতাভ আর ভিতরের-ঘরের-অমৃতাভ কি একই ব্যক্তি নয়? এতক্ষণ যে-মৌমিকে দেখছিল, এই ঘরে আসার পর থেকে ওকে কেন সেই পরিচিত গম্ভীর অচপল চৌকশ মেয়েটি নয়, মনে হলো সাদামাটা ঘরোয়া উচ্ছল একটি মেয়ে? পরনে যার আটপৌরে ম্যাক্সি, কোনোরকমে বাঁধা চুল, কানে ছোট্ট দুল; হাতে-গলায় কিচ্ছুটি নেই; চোখে কাজল নেই, ঠোঁটে লিপস্টিক নেই, কপালে টিপ পর্যন্ত নেই। সমস্ত কিছু মিলেমিশে একটা আলুথালু-ভাব। মনে হলো, বিস্রস্ত তবু বিপর্যস্ত নয়।

অমৃতাভকে ফ্রিজের থেকে ঠান্ডা পানীয়ের শরবত করে এনে দিল মৌমি। শরবত খাওয়ার অবকাশে অমৃতাভ ভাবছিল, কী কথা বলবে। কখনো কখনো কোনো কথা শুরু করা এত কঠিন! একটু বেশি সময় নিয়ে তাই শরবতটুকু খেল। আচমকাই মনে এল, সামনেই পরীক্ষা না মৌমির?

“তোমার পরীক্ষা যেন কবে?” জিজ্ঞাসা করল সে।

“এখনও দেরি আছে দু-মাস। জুনের শেষে।” গ্লাসটা হাত থেকে নিতে নিতে উত্তর দিল মৌমি।



“এম.এ পাশের পর কী করবে, ভেবেছ কি?”

“না। ভবিষ্যৎ নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই তেমন।”

“বাঃ! তাহলে আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অত ভাবনা কেন? পুরুষ বলেই কি? তুমি না রাজনীতি কর?”

“দেখো, আমি খুব সামান্য মেয়ে। তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট নই। তুমি ইচ্ছা করলেই তোমার কেরিয়ারকে আরো ব্রাইট করে তুলতে পার, যা আমি পারি না।”

“তুমি কিন্তু বাড়িয়ে বলছ। ইচ্ছা করলেই সব পারি না আমি। তাছাড়া, তুমি যে এত পড়াশুনা করছ তার তো একটা উদ্দেশ্য থাকবে?”

“থাকাটা হয়তো স্বাভাবিক। যুক্তিগ্রাহ্যও। কিন্তু আমার ব্যাপার হলো, সুযোগ পাচ্ছি তাই পড়ছি। যেদিন সুযোগ পাব না, ছেড়ে দেব পড়া।”

“সেদিন কী নিয়ে থাকবে তুমি?”

“সেকথা সেইদিন ভাবব। আগে তুমি বলো, লেখালেখি করছ তো?”

“নাঃ, লিখতে পারছি না।” একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল অমৃতাভর কথার পিঠে। “মনে হয় লিখে কী হবে, যখন দেখি এইসব লেখালেখি পাঠকের অবহেলায় পড়ে আছে। এত কৃপণ আর সংকীর্ণ হয়ে আসছে মানুষের সময় যে, শিল্পের জন্য সে আর মেধাকে ব্যস্ত করতে চাইছে না। শিল্প তার কাছে নিছক ভালো-লাগা বা আরামের জিনিস, ভালোবাসা বা আনন্দের নয়। তুমি তো বাংলা সাহিত্যের ছাত্রী, বলো তো শেষ এক-মাস কিংবা দু-মাস বা ছয়-মাসে পাঠ্যবইয়ের বাইরের কোন্ কবিতা পড়েছ? গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ কোনো? আধুনিক লেখাপত্তরের কথা ছেড়েই দাও। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, বিভূতিভূষণ বা মানিক? মনে পড়ে?”

মৌমি চুপ করে ভাবতে থাকে সত্যিই তো পাঠ্যবইয়ের বাইরে মাত্র দুটো গল্প পড়েছে সে *দেশ* পত্রিকায়। কবিতা? পড়েছে কী?

“অথচ দেখো, তথ্যের আগ্রহে কোনো ঘাটতি নেই আমাদের।” অমৃতাভ জুড়ে আনে কথা: “আজকের ছোটোরা সুকুমার পড়ে না, কিন্তু *হ য ব র ল* কার লেখা, তার পুত্রের নাম, পিতার নাম, জন্ম-মৃত্যু খুঁটিনাটি সব বলে দেবে। এমনকি *হ য ব র ল*-র সঙ্গে যে ক্যারলের *অ্যালিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড*-এর একটা তুলনা আছে তাও বলে দেবে হয়তো। মূল বিষয়ের বদলে বিষয়সূত্রের উপর নিরর্থক ঝোঁক ছোটোবেলা থেকেই এদের কল্পনাপ্রবণ মনকে করে তুলেছে যান্ত্রিক। সেইখানে আমি যা লিখি, অর্থাৎ কবিতা, তার ভবিষ্যৎ বড়োই করুণ। মন দিয়ে দশ জন পাঠকও যদি পড়ে থাকেন আমার লেখা, তাতেই খুশি আমি।”

“তোমাকে তো কখনো এমন হতাশ দেখিনি। ব্যাপার কী?”

"হতাশ? একজন লেখক তার লেখা কেউ পড়ে না বলে যদি লেখা বন্ধ করে দেন, তাহলে তিনি কোনো লেখকই নন, বলেছেন খুব-সম্ভব তারকোভ্স্কি। কিন্তু অনাদর যদি চলতেই থাকে তাহলে কিসের জন্য যে লেখা, সেকথা মনে হওয়াটা কি স্বাভাবিক নয়?"

"তবু..."

"তবু-কিংবা-কিন্তু নয় মৌমি। লেখক না-লিখে পারেন না বলেই লেখেন। পণ্য ও আভোগ তার কিছু করতে পারে না। একটা লেখার থেকে বড়ো শারীরিক তৃপ্তি তার আর কিছু নেই।"

"কিন্তু পাঠক? তার বেলা?"

"তারও পড়ার চেয়ে বড়ো কোনো শারীরিক সাধ নেই।"

"লেখক-পাঠকের কাজকে তুমি শারীরিক বলছ?"

"অবশ্যই। দেহ ছাড়া মেধা হয় নাকি? মেধা ছাড়া হৃদয়? যা কিছু সুন্দর, মহৎ তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের যোগ থাকবেই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিল্পের মধ্য থেকে যে-অনুভূতিকে পাই আমি, তা এক অর্থে শরীরী শিহরন ছাড়া কিছু নয়।"

"তোমার কথা শুনলে আমার বিশ্বাস টলে যায়। ভয় হয়।"

"কেন? ভয় কেন?"

"মনে হয় তুমি যেন আমাদের চারপাশের কেউ নও। সভ্যজগতের কেউ না। আদিম কোনো মানুষ!" মৌমির কথায় কোথায় যেন একটা অসহায় ভাব।

"মানুষ তো? যাক বাবা, আদিম কোনো প্রাণী ভেবে বসোনি! কিংবা বর্বর!" পরিবেশ ইচ্ছা করেই হালকা করে দিতে চায় অমৃতাভ। সে বেশ বুঝতে পারে তার জগৎ থেকে মৌমি সরে যেতে চাইছে।

"কিছু খাবে? ফ্রেঞ্চ টোস্ট?" নিজের জগৎ তৈরি করার জন্য মৌমি সত্যিই তবে অবকাশ পেতে চাইছে।

"নাঃ, খাব না কিছু। তুমি আর তোমার এক বন্ধু... কী যেন নাম... ডাক্তার... অভিজিৎ?"

"হ্যাঁ, অভিজিৎ ঘোষ।"

"একটা পত্রিকা বার করছিলে, তার কী খবর?"

"প্রথম সংখ্যা তো তোমাকে দিয়েছি। দ্বিতীয় সংখ্যা বেরুবে। তুমি একটা লেখা দিও তো!"

"কী লেখা চাও? পদ্য না গদ্য?"

"গদ্য, প্রবন্ধ, গল্প— যা ইচ্ছা। একটাই শর্ত, ছদ্মনামে লিখতে হবে।"



"ছদ্মনাম কেন?"

"আমাদের দলের অনেকেই তোমার কথা জানে। আমি চাই তোমার লেখা ওদের কাছে গোপন রাখতে।"

"গোপন কেন?" অমৃতাভ বুঝতে চাইল মৌমিকে।

"এত কেন-র উত্তর দিতে পারব না।" অসহিষ্ণু মৌমি নিজেকে গুটিয়ে নিতে চাইল।

"বেশ। তাই হবে। কিন্তু আমারও শর্ত আছে একটা। যা লিখব তা হুবহু ছাপতে হবে। তোমাদের অপছন্দ হলেও। রাজি?" অমৃতাভ ইচ্ছে করেই মৌমিতার শর্তের উপর নিজের শর্তকে চাপিয়ে দিয়ে দরকষাকষির খেলা খেলতে চাইল।

"রাজি।" সম্মতি জানিয়ে খাট থেকে নেমে দাঁড়াল মৌমি। "তুমি একটু একলা বোসো। আমি গা ধুয়ে আসছি।"

অমৃতাভ দেখল, প্রায় ছ-টা বাজে। সন্ধ্যা হব-হব ভাব। লোডশেডিং। মোমবাতি জ্বালিয়ে রেখে চলে গেল মৌমি। একা থাকতে থাকতে অমৃতাভর মনে হলো এতক্ষণ তার সঙ্গে বসে যে-মেয়েটি কথা বলছিল, সে কি মৌমিতাই? মৌমিই যদি হবে, এই বাড়িটিকে হঠাৎ অচেনা মনে হচ্ছে কেন? এ কোথায় রয়েছে সে? অবরুদ্ধ হয়ে? মনে হলো এখান থেকে কোনোদিন হয়তো আর বেরুতেই পারবে না। আটকে পড়েছে চারদিক থেকে। চারপাশের আসবাব ও আতিশয্যের মধ্যে। হাঁফ-ধরা সেই ভারের ভিতর বসে থাকতে থাকতে চোখ গেল বইয়ের র‍্যাকের দিকে। সেখানে খুঁজে পেল তার অত্যন্ত প্রিয় একখানা বই— *কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো*। মোমবাতির কাঁপা আলোর নীচে মেলে ধরল বইখানা আর, পড়তে শুরু করে দিল। কতক্ষণ পড়েছে জানে না, কিন্তু আচমকা একটা মোহময় গন্ধ তার মনঃসংযোগে চিড় ধরিয়ে দিল। মুখ তুলে দেখল সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এক নতুন মৌমি। পরনে ঢোলা নীল ম্যাক্সি, কপালে নীল টিপ, ঠোঁটে বেগুনি রং। হাতে ধরা প্লেটে মিষ্টি সাজানো। "নাও, এগুলো খেয়ে নাও চটপট।" প্লেটটা নামিয়ে রেখে বলল ও। তারপর ড্রেসিং টেবিলের সামনে টুলটায় গিয়ে বসল। ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ভিতর আর বাইরে মিলিয়ে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মৌমিকে দেখতে পেল অমৃতাভ। ত্রিমাত্রিক মৌমির বুক-পিঠ, গলা-কাঁধ, মুখ-খোঁপার দৃশ্যে সে নির্নিমেষ তাকিয়ে রইল।

"কী দেখছ অত?"

"আয়নার ভিতরে-বাইরে এই-যে বসে আছো তুমি— তাকেই দেখছি। এভাবে তোমাকে কখনো দেখিনি কি-না!"

"তাই বুঝি?" ঠোঁটের কোণে হাসি ছড়িয়ে দিতে দিতে বলল মৌমি।

"আচ্ছা, একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ গন্ধ পাচ্ছি যেন। কেমন অন্যরকম অথচ খুব চেনা।"

"ল্যাভেন্ডার ডিউ। পাউডারের।"

পাউডারেরই কি শুধু? এই গন্ধ? এত চেনা? অমৃতাভর মনে পড়ে গেল ভিক্টোরিয়ার মাঠে দেখা সেই মেয়েটির কথা। সেদিন তার শরীরেও কি তবে এমনই গন্ধ ছিল? কিন্তু কী করে মৌমিকে বলবে সেই কথা? বলা যায়? লজ্জা নয়, সংকোচ নয়, অপরাধবোধও নয়, মনে হলো সেদিনের কথা শুনলে মৌমির হয়তো ঘেন্না হবে। অমৃতাভ যে সত্যিই ভালোবাসে মৌমিতাকে, সেই স্পর্শকাতরতালীন অনুভব এক লহমায় বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। "কী হলো, চুপ হয়ে গেলে কেন?" মৌমি জানতে চাইল।

"গন্ধই নয় শুধু। তোমাকে দেখতে দেখতে মনে পড়ে যাচ্ছে বইমেলার সেইদিনের কথা। সেই প্রথম আমি বই কিনে দিয়েছিলাম তোমাকে। *আউটসাইডার*। পড়েছিলে সেখানা?" সেদিনের সেই বইয়ের, সেই মেয়েটির গন্ধের স্মৃতি আজও এড়াতে পারে না অমৃতাভ।

"অমৃত! তুমি এত স্মৃতি নিয়ে থাকতে ভালোবাসো কেন বলো তো? এই-যে মুহূর্ত, বসে আছি আমি আর তুমি, এই আলো-আঁধারের মধ্যে— এসবের কি কোনো মূল্যই নেই তোমার কাছে?"

"নিশ্চয়ই আছে। আগামীকাল তোমাকে ভাবব যখন, তখন আজকের এই মুহূর্তই উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। স্মৃতিচারণের মধ্য দিয়ে আমি এক নতুন বর্তমান খুঁজে পাই। আমরা সকলেই হয়তো। বিস্মৃতির বর্তমান। যেমন বইমেলার সেই দিনটি আজ এই মুহূর্তে এক অপরিসীম আনন্দে ভরে উঠেছে। এইমাত্রই যার আবিষ্কার সম্ভব হলো। স্মৃতির ভিতর দিয়ে গতদিনের যে-স্বাদ পাই আমি, তা ফুরিয়ে-যাওয়া কোনো অতীত নয়, যেন দেখি আজকের এই দিনকেই, দেখি বর্তমানকে কত সহজে জড়িয়ে নিয়েছে তা টুকরো টুকরো বিস্মরণের আভায়। এই-যে দেখছি তোমাকে, মিলিয়ে নিচ্ছি বইমেলার সেই দিনের অনুষঙ্গে, তা অন্য এক তোমাকেও মেলে ধরছে আমার সামনে। এ কি কেবল অতীতেই পর্যটন মৌমি? এও তো এক পরম্পরা— বিস্মৃত হতে হতে সময়কে তার সীমানা থেকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ক্রমাগত।"

"এমন কথা বলো তুমি, মনে হয় আগেই ভেবে রেখেছ সবকিছু। এখন শুধু মুখস্থ আউড়ে চলেছ।"

"আসলে অনুভূতির ব্যাপারস্যাপার এতই ব্যক্তিগত আর ব্যাখ্যাতীত যে, আমাকে বানাতেই হয় কথা। কথার পরে কথা। কথা হি কেবলম্!"

"আর তাই কথায় কথায় তুমি এখনও একটাও মিষ্টি মুখে দিলে না!"



"তোমাদের বাথরুমটা কোন্ দিকে, মৌমি?"

"হাত ধোবে?"

"না।"

"দাঁড়াও, মোমবাতি জ্বেলে দিই।"

"দরকার নেই। এখনও সন্ধের আলো আছে মৃদু।"

মৌমিতা অমৃতাভকে তাদের ডাইনিং হলের ভিতর দিয়ে বাথরুমের কাছে নিয়ে এল।

বাথরুমে ঢুকে অনেকক্ষণের জমে-থাকা পেচ্ছাপ নিঃসরণ করতে করতে অমৃতাভ তলপেটে যুগপৎ স্বস্তি ও কম্পন অনুভব করল। মনে হলো ক্রমশ সেখানে জমে উঠছে এক স্পন্দন। ভারী আর কঠিন হয়ে পড়ছে তার শিশ্ন। হঠাৎ যেন অসংখ্য বিদ্যুৎ ছুটে গেল। পেচ্ছাপ শেষ করেও সে দাঁড়িয়ে রইল বহুক্ষণ। সাবানের ঘ্রাণ, অন্ধকারের আবছায়া আর বাথরুমের স্যাঁতসেঁতে শীতল পরিবেশের মধ্যেও যে-উষ্ণতা অনুভূত হচ্ছে তার কার্যকারণ কী। মৌমির ঢোলা পোশাক? নীল টিপ? ঠোঁটের বেগুনি রং? নাকি পাউডার ও ঘামের অতিপরিচিত সেই ঘ্রাণ? নাকি এই-যে সে এইমাত্র এখানে প্রস্রাব করল, যেখানে কি-না কিছু আগেই মৌমি গা ধুয়ে গেছে, সাবান মেখেছে, পোশাক বদলেছে, সেইখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে বলেই এত কম্পনকাতর হয়ে উঠেছে? বাথরুম-থেকে-বেরুনো-অমৃতাভ কি তবে বাথরুমে-প্রবেশের-আগের-অমৃতাভর থেকে বদলে যাবে?

অবশেষে বাথরুমের সেই খণ্ডজগৎ থেকে বেরিয়ে আসে অমৃতাভ। মৃদু আলো অনুসরণ করে মৌমিদের ঘরের সামনে দাঁড়ায়। দেখে, চিবুকে হাত রেখে বুকের উপর শুয়ে কোনো-এক বইয়ের পাতায় ঝুঁকে আছে ও। লণ্ঠনের মৃদু আলো আলতো হয়ে ছড়িয়ে আছে শরীরে। ব্রেসিয়ারের জমাট বন্ধন অস্বীকার করে সামান্য কিন্তু অনস্বীকার্য বেরিয়ে পড়েছে অংশত দুটি স্তন। কোমর থেকে নেমে এসেছে দুই অকরুণ উরু। অমৃতাভর চোখের সামনে ঝাপ্সা হয়ে যাচ্ছে মৌমির বক্ষঃস্থল, জঙ্ঘা ও নিতম্ব। ভেসে উঠছে অবিরাম এক দেহের ক্ষরণ। তীব্র, শীতল। মাইনাস ডিগ্রির ঠান্ডায় যেন তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক খাদের কিনারে। যেখান থেকে শুরু হবে অনিবার্য পতন। আর সেই পতন মৌমিকে প্রদক্ষিণ করে নেমে যাবে নীচে, আরো নীচে। যেখানে কিছুক্ষণ পরেই হয়তো তার চেতনার অবলুপ্তি ঘটবে। কিন্তু সেই নিশ্চেতনের মুহূর্তের আগেই তাকে মুক্ত হতে হবে। অবরোধের থেকে ছিটকে বেরুতে হবে কেন্দ্রাতিগ টানে।

"এবার আমি যাব মৌমি।" ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বলল অমৃতাভ। চৈতন্যে কি ফিরে

এল তবে?

"এখনই? আর-একটু বসো। আর কিছুক্ষণ।"

"না। সাড়ে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে পৌঁছুতে হবে এক জায়গায়।" টিউশনের কথা মনে পড়ল হঠাৎ? নাকি পালাতে চাইছে অমৃতাভ?

"না-হয় আজ গেলে না সেখানে। এত কাছে, এত আপনার করে কোনোদিন পাইনি তোমাকে।" কী বলতে চাইছে মৌমি?

"জানি। আমারও কি ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করছে তোমাকে? একজনকে দেখা করব কথা দিয়ে রেখেছি যে!"

"তাহলে আটকাব না। যাও।" আটকে রাখতে পারে না বলেই মৌমিতা কখনো অমৃতাভকে ধরেও রাখতে পারে না। মুনমুন কি জানত সেকথা? জানত বলেই কি অমৃতাভকে অত সহজে বেঁধে ফেলতে পারত?

"নাও, এবার মিষ্টি ক-টা খেয়ে নাও অমৃত। ওগুলো না খেয়ে যেতে পারবে না।" অগত্যা ইচ্ছার বিরুদ্ধেই সেইসব মিষ্টিগুলো গিলে নেয় সে। গোগ্রাসে অনেকটা জল খায়। তারপর সেই অন্ধকার বাড়ির ভিতর মৌমিকে ফেলে রেখে বেরিয়ে পড়ে। ঠিক তক্ষুনি চারপাশ ঝলসে দিয়ে কারেন্ট ফিরে আসে। সেই আলোতে সে স্পষ্ট দেখতে পায় দুপুরের সেই বউটি ঘাটের সিঁড়িতে বসে জলের ভিতর দুলিয়ে যাচ্ছে ওর পা-দুটিকে।

টিউশনিতে অবশ্য আর যেতে ইচ্ছা করে না তার। ভয়ংকর এক অবসাদ এসে গ্রাস করে। তবু অনেক অনেক দূর পর্যন্ত এলোমেলো হেঁটে বেড়ায়। প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে বাস ধরে ফিরে আসে বাড়ি। সারাদিনের প্যাচপেচে শরীর থেকে মুক্তি পেতে ঢুকে পড়ে বাথরুমে। নগ্ন শরীরের ক্লেদ সাফ করতে করতে ক্রমশ নার্সিসাস হয়ে উঠতে চায় সে। জলের প্রবাহে ভেসে যেতে থাকে তার রক্তমাংস, যৌনতাড়স।

**বাথরুম**

এ এক রসায়ন যেখানে মানব-মানবী নিঃসঙ্গতাকে বুঝে নিতে পারে। বুঝতে পারে অখণ্ড নির্ভার জীবনের নানান সব জলছবিকে। তার দেহ, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, প্রতিটি রোমকূপ মিলেমিশে যেন এক ভাস্কর্যের রূপ নিয়ে তার নিজের সামনে দাঁড়িয়ে। সে যেন একা নয়। দুজন মানুষ। আপন-পর হয়ে মিশে আছে। ঐহিক, পারত্রিক। যেন মিড় হয়ে অনায়াস বেঁধে চলেছে যুগলবন্দি— শরীরে প্রবাহিত জলের ধারা চুঁয়ে চুঁয়ে।

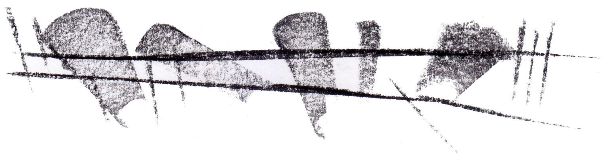

## শ্বাসাঘাত ডুবে যায়— মহাপতনের

এক দল যুবক ধরাধরি করে অমৃতাভকে বাড়ি নিয়ে এল। বাড়ির লোকজন, প্রতিবেশীরা দৌড়ে এলেন, কী হয়েছে? অমৃতের মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে একটি ছেলেকে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "বাবা, কী হয়েছে ওর? কথা বলছে না কেন?" ছেলেটি কোনো উত্তর দেবার আগেই বলিষ্ঠ এক যুবক এগিয়ে এল: "কী হয়েছে তা আপনারাই ভালো বলতে পারবেন। আমাদের মনে হয়েছিল উনি হঠাৎ রেললাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। অমৃতদাকে অনেকেই চেনে, তাই থানা-পুলিশের হ্যাপায় আমরা যাইনি।" "তোমরা ঠিক বলছ বাবা? আত্মহত্যা?" "উনি অবশ্য বলছিলেন আচমকা ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সুকান্তদাই টেনে সরিয়ে নেয়, নয়তো—" এবার সেই ছেলেটি জবাব দেয়। বলিষ্ঠ যুবকের নাম যে সুকান্ত, আর এই-যে ছেলের প্রাণ বাঁচিয়েছে, কথাটা জেনে মা ওকে কাছে ডেকে নেন, "বেঁচে থাকো বাবা। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।" "ভগবান না-হয় পরে মঙ্গল করবেন, তুমি তো আগে ওদের চা-জলখাবার কিছু দাও," এতক্ষণে অমৃতাভ কথা বললে, "তবে এটুকু জেনে রেখো মা, আত্মহত্যার কোনো চেষ্টাই আমার ছিল না।" সকলকে উদ্দেশ্য করেই যেন কথাগুলো উচ্চারণ করল সে। প্রতিবেশীদের সামনে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ বাড়ির সকলকে ভীষণ অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। মনে হয়েছিল কিছুক্ষণের মধ্যেই পাড়া-জানাজানি হয়ে ঘটনাটা সেন পরিবারের কেচ্ছা হয়ে দাঁড়াবে। সেখানেই সংকোচ, সেখানেই দ্বিধা। আর সে-কারণেই, অমৃতাভ জোরের সঙ্গে আত্মহত্যার প্রসঙ্গ অস্বীকার করতে চাইল। কিন্তু এইভাবে কি চাপা দেওয়া যায়? গল্প যেখানে প্রশ্রয় পায় সেখানেই গুজবের আশ্রয়। অমৃতাভর- ভারসাম্যহীনতার-বিষয় থেকে অমৃতাভর-আত্মহত্যার-প্রসঙ্গ অনেক বেশি গল্পময়ই নয় শুধু, আকর্ষণীয়ও বটে।

আরো কিছুক্ষণ পর, সকলে একে একে চলে গেলে, অস্বস্তিকর এতটা সময় অমৃতাভকে তাড়া করে বেড়াতে থাকল। কিছুটা স্বস্তির খোঁজে দোতলার উপরে চিলেকোঠার ঘরে উঠে এল সে। চোখ বুজে পড়ে থাকতে থাকতে কপালে এক

সস্নেহ স্পর্শ অনুভব করল। মা। চোখ খুলতেই প্রশ্ন: "কী হয়েছিল অমৃত, শাশ্বতীর সঙ্গে কি কোনো—"। শাশ্বতী অমৃতাভর বউ। এই ভয়টাই করছিল সে। সবচেয়ে আপনজনেরাও তার কথা বিশ্বাস করবে না। যে হয়তো-বা একমাত্র বুঝবে তার কথা, সেই শাশ্বতীই হয়ে উঠবে সন্দেহের নিমিত্ত। বিবাহিত জীবনের সব ভালোমন্দের মাপকাঠি একটি পারদেই যাচাই করতে অভ্যস্ত মানুষ। পুরুষের জন্য বউ আর, মেয়েমানুষের জন্য বর। "আমাকে একটু একলা থাকতে দাও মা, আমি ঘুমাব।" জোর করে মার স্নেহ এড়াতে চাইল? কিছুক্ষণ পর সিঁড়ি বেয়ে মায়ের পায়ের শব্দ মিলিয়ে যেতে শুনল সে। শাশ্বতীকে খুব কাছে পাবার ইচ্ছা হলো। কিন্তু অনেকক্ষণের প্রতীক্ষাতেও শাশ্বতী এল না তার কাছে।

ঘুম আসছে না। শুধু অসংখ্য চিন্তার স্রোত আছড়ে পড়ছে মাথায়। শাশ্বতীর সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই শুরু তার এই ভারসাম্যহীনতার বোধ। তাদের মিলনের প্রথম রাত থেকে আজ পর্যন্ত যতবার মিলিত হয়েছে, ততবারই এই অনুভব তাকে তৃপ্তিকর এক অপ্রাণজগতে নিয়ে গিয়েছে। শাশ্বতীকে বলেওছিল সেকথা। শাশ্বতী বলেছিল কোনো সাইকোলজিস্টের পরামর্শ নিতে। অমৃতাভ যায়নি, কারণ, তার এই ভারহীনতা যে অদ্ভুত এক সুখ, এবং কোনোমতেই সে সেই আহ্লাদটুকু হারাতে চায় না। সাইকোলজিস্ট কি সত্যি রাখে মনের খবর? জানে, কিভাবে স্নায়ুকে শিথিল করে দেওয়া যায়? এই অনুভব যে তার জীবনের সঙ্গে এতদিনে মিলেমিশে গিয়েছে! একে হারালে হয়তো বাঁচবেই না আর!

খুব মনে পড়ে, প্রথম মিলনের রাতে আকাশ থেকে চাঁদ ঢুকে পড়েছিল বিছানার উপর। শীতের সামান্য শুরুর সে-সময়। অমৃতাভর প্রতিটি স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছিল শাশ্বতীর দেহ। নরম এক-একটি মুহূর্ত গড়িয়ে গড়িয়ে তাদের শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে যাচ্ছিল অতীতের দিকে। কোন্-এক অনিবার্যতায় তাদের পোশাক খসে পড়েছিল, যেন আদিগন্ত নগ্নতায় ডুবে গিয়েছিল তারা।

"চাঁদের আলোয় তোমাকে ভয় করছে আমার।" শাশ্বতীর কাঁপা স্বর।

"তাহলে চোখ বোজো তুমি।" অমৃতাভ নিজেকে গোপন করে নিতে চাইল।

"চোখ বুজলে মনে হয় প্রাণ নেই আমার।"

"তাহলে?"

"অন্ধকার করে দাও সব।"

"খুলে দেব খোঁপা? ছড়িয়ে দেব চুল?"

"জানি না।"

"চুমোয় ভরিয়ে দেব দু-চোখ?"



"জানি না।"

"তবে কি শিকড় থেকে তুলে আনব— তোমাকে সমূল?"

"জানি না।"

"তবে কি জলের মতো ঘুরে ঘুরে ভিজিয়ে দেব শরীর?"

"জানি না। কিচ্ছু জানি না আমি।"

"তবে কি ভেঙে দেব অলস মুদ্রা? পাখির মতো উড়িয়ে দেব তোমায়?"

"জানি না।"

"তবে কি হয়ে উঠব অশরীরী এক, শূন্য থেকে লুফে নেব তোমাকে?"

"কী জানি।"

"তাহলে এম্নি করেই থাকো। দেখো, কিভাবে এক শিকড় তোমার মায়াবী শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে অরণ্যের সবুজ ছড়িয়ে দিচ্ছে। বলতে বলতে হঠাৎ মনে হয় অমৃতাভর, সে ক্রমশ হালকা হয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে শাশ্বতীকে জড়িয়ে ধরে সে। যেন বিচ্ছিন্ন হলেই উড়ে যাবে মহাশূন্যে। ক্রমশ আরো, আরো জোরে জাপটে ধরে তার সমস্ত নিষ্ঠুরতা ও শক্তি দিয়ে। পাশবিকতায় শাশ্বতীকে পিষেই ফেলবে বুঝি। তারপর একসময় তার সব শক্তি ফুরিয়ে আসতে থাকে। শাশ্বতীর শরীর থেকে গড়িয়ে পড়তে পড়তে টের পায় চেতনা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে যেন। ভেসে যাচ্ছে অমৃতাভ আর, তার ভাসমান শরীরকে শাশ্বতী পরম যত্নে টেনে নিয়ে চলেছে লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানা সব রঙের বলয়ের গভীরে।

কাল রাতেও শাশ্বতীর সহবাসে কেন্দ্রাতিগ সেই টান ও ভারশূন্যতায় সে চৈতন্য হারিয়েছিল। ভোরবেলা জেগে উঠে প্রথমে মনে হলো পায়ের নীচে সবকিছু দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। পড়ে যেতে যেতে মনে হলো শরীরের থেকে তার মাথাটা যেন বেমানান হালকা। তবে কি শাশ্বতীর দেহের নিবিড়তায় অমৃতাভর শরীরের ভারকেন্দ্রই বদলে গিয়েছে? বেঁকেচুরে গেছে তার দেহ? অস্তিত্ব? কিন্তু এভাবে পথ চললে যে সে পড়ে যাবে! যে-শক্তি পৃথিবীর জড় ও জীব -জগৎকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে মাটির উপর, কোনোদিন ছিটকে ফেলে দেয়নি অন্য গ্রহ-পৃথিবীর দিকে— পরম মায়ায়, আদরে জড়িয়ে রেখেছে— সেই অভিকর্ষ কি তবে অমৃতাভর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে? এমন যদি অতি-প্রাকৃত ঘটেই যায়, অমৃতাভর দেহস্থ কোষ-কণা-প্লাজমা-লসিকার কী হবে? দৃষ্টি-গন্ধ-স্পর্শ-স্বাদ— এইসব ইন্দ্রিয় অনুভবেরই-বা কী হবে? জড়ত্ব হারিয়ে গেলে জীবনের পরিণাম কী?

গতকাল রাতের সংগমের কারণেই অমৃতাভ যে প্ল্যাটফর্মে হঠাৎ টলে গিয়েছিল আজ, সেকথা কি বোঝানো চলে? নাকি বোঝা যায়? মানুষের সব অনুভূতির কথা সব

মানুষের কাছে প্রকাশ করা সম্ভব? তাই কি কবিতা লেখে অমৃতাভ? এখন লিখবে?

*কাকে বলি শব্দ?*
*তুমি বললে, বাঃ! ভা-রি জব্দ!*
*আমি বলি, নাজেহাল না নাস্তানাবুদ—*
*কোন্‌টা জুতসই?*
*তুমি গালে টোকা মেরে বললে, কিছুই বোঝো না ছাই!*
*আমি ভাবি, বুঝমান হবার যে কী গেরো*
*এতদিন হাড়ে-হাড়ে পাইনি কি টের?*
*অতঃপর ভাষাকে চোখের সঙ্গে তুলনায় সায় দেয় মন—*
*মন... মনপাখি... ম-ন-পা-খি-রে তুই...*
*তোমাকেও চুমো দিতে পারি।*
*শোনো।*
*তোমাকেই নগ্ন করে দেখি।*
*বলি, এই নাও চোখ, মাতৃভাষা, দেশ*
*ঝলমল করে ওঠো তুমি,*
*বেশ।*

লেখা শেষ করে মনে মনে দু-তিনবার আবৃত্তি করে সে। প্রথমে লিখেছিল, 'তুমি ঝলমল করে ওঠো, বেশ', পরে তা কেটে লিখে নেয়— 'ঝলমল করে ওঠো তুমি, / বেশ'। তারপর একটা স্বস্তির আবেশে নিজেকে এলিয়ে দেয় বিছানার নিবিড় আলস্যে। নৈঃশব্দ্যের ভিতরে।

"কিছু খাবে?" এতক্ষণে শাশ্বতী এসেছে তার কাছে।

"না। তুমি খেয়েছ?"

"হ্যাঁ। অফিসের টিফিনটা বের করে দিই, খেয়ে নাও।"

"এখন থাক। পরে খাব। তুমি বসো।"

"ঘুমিয়েছিলে?"

"নাঃ। কবিতা শুনবে? এক্ষুনি লিখলাম।" কবিতাটা পড়ে চলে অমৃতাভ। শাশ্বতী তার পাশে এলিয়ে দেয় শরীর। চুপ করে শুনতে থাকে।

"ঝলমল করে ওঠো তুমি, / বেশ।" কবিতা পড়া শেষ করে অমৃতাভ। কলম আর খাতা সরিয়ে রাখে বালিশের পাশে। শাশ্বতী পাশ ফিরে হাত বুলোতে থাকে পরিত্যক্ত খাতাটার উপর। ধীরে ধীরে যেন শিথিল হয়ে আসে ওর শরীর। ফ্রিজ থেকে



বের-করা মাখনের মতো গলে যেতে থাকে। আর তারপর, কাপড়ের মোড়ক থেকে গলিত পিচ্ছিল শাশ্বতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোকে উন্মুক্ত করতে করতে অমৃতাভ ১২-১৩ ঘণ্টার ব্যবধানে অভ্যাসের নিজস্ব ঢঙে ফের ঝুঁকে পড়ে অনিবার্য পতনের দিকে।

**মুদ্রা ১: ক্ষুদ্রত্ব**

বস্তু ভেঙে তার অনুরূপ বস্তু পাওয়া যায়। আরো ভাঙতে ভাঙতে অণু, পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন— হাজারো সব কণাদের। বস্তু আর অণুর ধর্ম এক। কিন্তু তারপর যত ক্ষুদ্রে ভেঙে যেতে থাকে অণু, ততই ধর্ম বদলে যেতে থাকে তার। এইসব কণারা ইন্দ্রিয়ের অতীত। বস্তুখণ্ডে তাদের চলাফেরা, গুণাগুণ— বুদ্ধি ও পরিমাপেরও অতীত। এই কণাদের ভর বিলুপ্ত হলে যে-পরিমাণ শক্তির উদ্ভব, তা এই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে পারে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কণার ভিতরের এই অমিতশক্তি সূত্রাকারে যতই $E= mc^2$ হয়ে থাক-না-কেন, অমৃতাভর চেতনায় তা বিশ্বপ্রজাতির লুপ্তিতে ক্রম প্রতীয়মান যেন। তার ভারসাম্যহীনতা ও রিরংসার পিছনেও নিঃশব্দে ঘটে চলেছে ভরের অবলোপ। আলোকবর্ষ থেকে আলোকবর্ষে ভেঙে চলেছে বস্তু— শূন্যতার দিকে। মানুষের চিন্তাচৈতন্য সেখানে শুধু এক-একটা মুহূর্ত, সময়ের ভিতরে সময়। যেভাবে শাশ্বতীর নিবিড়ে অমৃতাভ ক্রমাগত ছোটো থেকে ছোটো হয়ে যেতে থাকে। ভেঙে যেতে থাকে অক্ষর থেকে বর্ণে— অ+ম্+ঋ+ত্+আ+ভ্+অ।

**মুদ্রা ২: রূপভেদ**

কোনো কোনো মৌল একই বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েও গঠন ও বৈশিষ্ট্যে বিভিন্ন রূপের হতে পারে। ভুসোকালি আর হিরে— কার্বন দিয়ে তৈরি অথচ নিজেদের থেকে কত আলাদা। মৌল প্রাণহীন। কিন্তু অমৃতাভ? তার প্রাণ আছে, জননক্ষমতা আছে, ইন্দ্রিয় আছে, বুদ্ধি আছে (বুদ্ধি! দুই আর দুই যোগ করে চার বানিয়ে তোলার অবশ্যম্ভাবী যুক্তিজ্ঞান!)। শাশ্বতীর সঙ্গে যৌনমুহূর্তগুলিতে নিয়ত তার শরীরও তো বদলে যায়। তবে কি এ-ও এক রূপভেদ? এ কি তার বুদ্ধির কারণে? নাকি বুদ্ধির অবলোপ তাকে বদলে বদলে দেয়? 'সে' বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিভিন্ন রূপে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মৌলের বিপরীতে অতিপ্রাকৃত এই রূপভেদ অমৃতাভকে তাই কি ক্রমশ রক্তমাংসের করে তোলে? বানিয়ে তোলে 'আমি'কে?

**মুদ্রা ৩: ঘুম**

ভারশূন্য শরীরে ক্লান্তির আবেশে জড়িয়ে আসে চোখ। ঘুমের এই প্রাক্-মুহূর্ত কি চেতনা ও নিশ্চেতনার মিলনমুহূর্ত? অমৃতাভ অনুভব করে কল্পনার এক মায়াবী জগৎ। যেন মেধার গভীরে খেলা করে তা। জেগে জেগে যা কিছু মনে পড়ে তার, সেইসব স্পষ্ট দেখতে পায় এখন। দেখতে থাকে অন্ধকার আকাশের আলো-রেখাগুলি, দেখতে পায় ছায়াপথ জুড়ে কোটি কোটি নক্ষত্রের চলাফেরা, এমনকি সময়ের প্রবাহ। মনে হতে থাকে, কবেকার কোন্ মমতা-মাখা কোমল

আঙুল এসে তার চোখের পাতার উপর বুলিয়ে চলেছে স্পর্শ। এইসব স্পর্শেরা কোনো স্বপ্ন নয়, কোনো কামনা নয়, এমনকি নয় কোনো খেদ বা সুখানুভব। শুধু একটু ছোঁয়া। থেমে-যাওয়া বাতাসের মতো ভারী। অমৃতাভর দুটি চোখের তারার সংস্পর্শে সেই বাতাস ক্রমাগত যে-মুদ্রা গড়ে তোলে তার মধ্যে সে খুঁজে পায় নির্ভয় নির্ভার— এক সমাপতন। তবে কি ঘুম কোনো সত্যজ্ঞান?— অতিজৈবনিক? জীবনের ছায়াগুলি নিয়ে উড়ে চলে শতসহস্র আলোকবর্ষের পারে? ঘুমের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতে তাই কি সে শুনতে পায় মায়ের হৃৎস্পন্দনের শব্দ? কোমল গান্ধার?

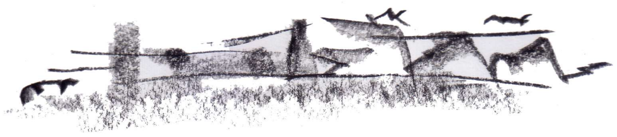

## হঠাৎ কার্ফু তল্লাটে, হাড়হিম কুচকাওয়াজ

সন্ত্রাস গ্রাস করে নিচ্ছে স্বাভাবিক জীবন। কোথাও রেললাইন উড়ে যাচ্ছে টাইমবোমায়। কোথাও-বা পার্সেলে বোমা পুরে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে সরকারি দপ্তর। কখনো আবার ট্রেনের কামরায় মলোটব ককটেল ছুঁড়ে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে সাধারণ মানুষজনকে। কখনো-বা উঁচু-নিচু জাতের নামে শুরু হয়ে যাচ্ছে রক্তক্ষয়ী খুনোখুনি। মন্দির কিংবা মসজিদ জোর করে ভেঙে দিয়ে তৈরি করা সাম্প্রদায়িক অবিশ্বাস। দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গা। মুক্তিপণের দাবি তুলে হত্যা করা হচ্ছে নিরীহ মানুষ। পুলিশ থেকে মিলিটারি, তাদের বিকৃত কামে দলিত আদিবাসী মেয়েদের ধর্ষণ করে গায়েব করে দিচ্ছে লাশ! প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-রাষ্ট্র-আইন সবকিছুকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তবু এইসব সন্ত্রাসবাদীরা মিশে থাকছে জনজীবনে— এমনকি নির্বাচন ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে এরাই কেউ কেউ হয়ে উঠছে রাষ্ট্রব্যবস্থার নিয়ামক!

এইসব হিংসা, সন্ত্রাস ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিহাসের মধ্যে অমৃতাভর নিজেকে দিন দিন অসহায়, অকিঞ্চিৎকর মনে হতে থাকে। প্রতিদিনের বেঁচে-থাকার অনিশ্চয়তার মধ্যে নিজের জীবনকে মনে হয় কল্পলোক! কল্পনার বলেই কি সে আজও বেঁচে আছে? নাকি আসলে সে বেঁচে আছে মায়ার ভিতর? বহু জীবনহানির সন্ত্রাসের মধ্যে অমৃতাভর যে প্রাত্যহিক জীবন, সে যেন তার নিজের জীবন নয়। এই জীবনের উপর কোনো অধিকার নেই তার। এ যেন প্রত্যহ বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, পাড়াপ্রতিবেশীর ভিতরে ভারশূন্য বয়ে বেড়ানো এক দেহজীবন। কুলহীন, কিনারাবিলীন। তবু তাকে দিনগুলির থেকে রাতগুলির দিকে আর রাতগুলির থেকে দিনগুলির দিকে সময়ের নিয়মে চলে যেতে হয়। স্বপ্ন নয়?

থেকে থেকে শ্বাসকষ্ট হয়। এ কি দূষণের জন্যই শুধু? জেনেছে, অক্সিজেন-স্বল্পতা ক্রমাগত গ্রাস করে নিচ্ছে কলকাতার নগরজীবন। এই দূষণ-সন্ত্রাসেও অমৃতাভরা বাঁচে, প্রকৃতিই তাদের বাঁচার অবকাশ করে দেয়। আবার ক্ষয়কে তিলে তিলে চাগিয়ে দেয় ভিতর অবধি। ব্যাধির সন্ত্রাস।

লাইব্রেরিতে, অসংখ্য বইয়ের ভ্যাপাটে গন্ধের মধ্যে, অক্ষরপ্রবাহের ভিতর

অমৃতাভর শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায় আরো। তবুও সে লাইব্রেরিতে যায়। তীব্র, তীব্রতম শ্বাসকষ্টের মধ্যেও জড়িয়ে নেয় বই, অক্ষরগুলোর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে তার ফুসফুসের সোঁ সোঁ শব্দ শুনতে পায়। তারপর ক্রমে ফুসফুসের অনুভূতির থেকে স্নায়ুর অবসাদের দিকে সরে যেতে থাকে, চেতনা জীবন্ত হয়ে ওঠে, দেহ অসাড় হয়ে পড়ে। হয়তো সামান্য ঘুমিয়েই পড়ে সে।

আজও অমৃতাভ লাইব্রেরিতে এসেছে। আজ শ্বাসকষ্টের তীব্রতায় থেকে থেকে তার ঘুলিয়ে উঠছে পেট। খাদ্যনালীর থেকে উঠে আসছে বহুদিনের জমা শ্লেষ্মা ও কফ। আজ যে-বই নিয়ে সে বসেছে তার বিষয়— অর্থনীতি ও বিশ্বায়ন। বিপ্লব-বিদ্রোহকে নাকচ করে দিয়ে মুক্ত অর্থনীতি, ব্যাবসাবাণিজ্য ও লগ্নিপুঁজির বিশ্বায়নকে দারিদ্র্য, কুসংস্কার ও অশিক্ষার থেকে মুক্তির পথ বলে যুক্তিবিস্তার করা হয়েছে সে-বইটিতে। বলা হয়েছে, তৃতীয় বিশ্বের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেঙে পড়বে বিশ্বায়ন ও তথ্যপ্রযুক্তির কারণে। আরো বলা হয়েছে, শোষণ ও বঞ্চনার যুগ শেষ হতে চলেছে, লড়াই-মিছিল-মিটিংয়ের যুগ শেষ, শ্রেণিদ্বন্দ্বের ধারণা অচল আর, বিপ্লব হলো কল্পবিজ্ঞানের গল্প মাত্র। বইটা পড়তে পড়তে অমৃতাভর গা-গোলানো ভাব আর বিবমিষা তীব্র হয়ে উঠছিল। অগত্যা সে ছুটে লাইব্রেরির বেসিনে গিয়ে পেটের ভিতরের পচা খাবার, ফুসফুসে জমে-থাকা কফ বমি করে বার করে দিল। এতে তার শরীর-মন দুই-ই স্বস্তি ফিরে পেল। মাথার ভিতরেও বেশ হালকা ও ফুরফুরে ভাব অনুভব করতে পারল। তারপর পড়ার টেবিলে ফিরে বইটাকে ফেরত দিয়ে অন্য-একটি বই চেয়ে নিয়ে এসে বসল। এই বইটি সে অনেকদিন ধরে একটু একটু করে পড়ছিল। কবি জীবনানন্দ দাশের গদ্য ও চিঠিপত্রের সংগ্রহ। লেখক 'পৃথিবী ও সময়' নামে একটি লেখায় লিখেছেন—

*পৃথিবীর জাতিদের পরস্পরের ভিতর মৈত্রী স্থাপনের যে-চেষ্টা কিছুদিন থেকে চলে আসছে— যার ফলে বিভিন্ন জাতীয়তা পৃথক সভ্যতা ও সংস্কৃতি মেনে নিয়েও এক অচ্ছিন্ন মানবসমাজের আশ্রয়ে মানুষ ও জাতি অন্তর্লীন অথচ স্বাধীন হয়ে থাকবার সুযোগ পেতে পারে— আনন্দে ও শান্তিতে— সে-প্রয়াস যতটা কূটনৈতিক ততটা বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারেনি, এবং যেটুকু-বা সংস্কারমুক্ত সত্যার্থী হতে সক্ষম হয়েছে বলে মনে হয় তার চেয়ে ঢের কম অনুপাতে আন্তরিক হতে পেরেছে।*

রচনাটি পড়তে পড়তে অমৃতাভর কেন যেন মনে হলো, লাইব্রেরি-ঘরের অনুষঙ্গ বদলে গেছে। শ্বাসকষ্টের অনুভূতি সরে গিয়ে এখন একটা চাপা সংক্ষোভ প্রকাশ পেতে চাইছে। কিন্তু কেন? বুঝতে চাইল সে। বইয়ের অক্ষরগুলো থেকে চোখ সরিয়ে



সে ঘরের চারদিকে দৃষ্টি ফেরাল। মুহূর্তে চমকে উঠল, উলটোদিকের টেবিলের এক কোণে মৌমিতা বসে আছে। মৌমিতার নিঃশব্দ অবস্থানই কি তবে অবচেতনে বদলে ফেলেছে প্রতিবেশ? নাকি মৌমির শরীর থেকে উঠে-আসা ঘ্রাণ তার মনোজগতের সন্ন্যাস ভেঙে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে রেখেছে বিস্তীর্ণ টেবিলের উপর?

বইয়ের ব্যারিকেড থেকে অমৃতাভ লক্ষ করতে চাইল মৌমিতাকে। পরিচিত নয় অন্য-এক মৌমিতাকে। মনে হলো, এই মৌমির সঙ্গে কোনোদিন কোনো পথেই হেঁটে যায়নি সে। কোনোদিন বলেনি কথা। এমনকি, ভালোও বাসেনি কোনোদিন। কোথাও বড়ো একটা গরমিল ঘটে গেছে যেন। আরো কিছুক্ষণ ধরে লক্ষ করতে করতে সে বুঝতে পারল, মৌমিতা আর কুমারী মেয়েটি নেই— সে বিবাহিতা। তার সমস্ত দেহ থেকে সেই মদালস অহংকার ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। অমৃতাভর দেহ-মন আবিষ্ট পরকীয় হয়ে উঠতে চাইছে। অপেক্ষাকৃত শিথিল ও পৃথুল মৌমিতার অঙ্গসঞ্চালন প্রত্যক্ষ করতে করতে সে বুঝতে পারল, মৌমি মা হতে চলেছে। সেদিনের সেই অষ্টাদশীর শরীরের ঘ্রাণ তাই আজ অন্য জৈবনিক গন্ধে ভরপুর। ওর সঙ্গে আলাপচারিতায় অমৃতাভর আজ বিশেষ কোনো আগ্রহ হলো না ঠিকই, তবু নিজেকে ক্রমশ আরো আড়াল করে নিয়েও বইয়ের ব্যূহ থেকে অনুসরণ করে চলল মৌমিতাকে। হঠাৎ মনে হলো, ঠিক মৌমিকে নয়, সে অনুভব করতে চাইছে ওর শরীরের মধ্যে ক্রমশ বেড়ে-উঠতে-থাকা ভ্রূণকে। মনে হলো, সেই ভ্রূণের মধ্যে যে-জীবন আত্মস্থ হয়ে আছে, সেই জীবন কি ভবিষ্যতে কোনোদিন অমৃতাভ-মৌমিতার সম্পর্কের মুহূর্তগুলিকে জানতে পারবে? শাশ্বতীর শরীরের নির্ভরতায় বেড়ে উঠছে অন্য-যে-এক-ভ্রূণ— সে-ও কি ভবিষ্যতে কোনোদিন খুঁজতে চাইবে অমৃতাভর অস্তিত্ব? জীবন কি শুধুমাত্র দেহ থেকে দেহেরই বিস্তার? সময় ও মনের কি কোনো রেশ থাকে না তার নিভৃতে? ভাবতে ভাবতে অমৃতাভর খুব মায়ের সস্নেহ আশ্রয় পাবার ইচ্ছে হলো। সে-কারণেই কি কেবলই তার চোখ, লাইব্রেরি-ঘরের মধ্যে তার এই গোপন (!) অস্তিত্ব, দূর থেকে মৌমির দেহের নিবিড়ে আশ্বস্ত হতে চাইছিল?

এতসব ভাবনার প্রশ্রয়ের মাঝে কখন-যে মৌমিতা চলে গেছে— টের পেল না সে। এতটা সময় জুড়ে অমৃতাভ যে তার সঙ্গে ছিল, কোনোদিন জানতেও পারবে না মৌমিতা। হয়তো কোনোদিন আবারও দেখা হবে তাদের, কিন্তু সময়ের পুরু আস্তরণ থেকে সেইসব পুরোনো আভাস উন্মুক্ত হবার যুক্তিযুক্ত অবকাশই পাবে না। ধীরে ধীরে বইয়ের অক্ষরগুলো আবার তার চোখের সামনে উজ্জ্বল হতে থাকল—

*মানবমৈত্রীর পরিবর্তে জাতিবিদ্বেষ, দেশে দেশে সংঘর্ষ, নিরবচ্ছিন্ন রক্তান্ধকার আধুনিক ইতিহাসের পৃষ্ঠা অশুদ্ধ ভাবনা ও বিমিশ্র বাসনার শূন্যতা ও নিষ্ফলতায় আড়ষ্ট করে*

*রাখছে। পরের জিনিসে লোভ, নিঃসহায়কে নিংড়ানো, শোকাবহ স্বৈরাচার, বারবার যুদ্ধ, মন্বন্তর ও কালোবাজারের অন্ধ বিমূঢ়তা সৃষ্টি করে চলেছে। কিন্তু তবুও এটা মানব সভ্যতার উষাকুয়াশা, গোটা ভবিষ্যৎ হয়তো মানুষের সম্মুখে— এ-কথা ভেবে ও মানুষের মানবতা মাঝে মাঝে স্তিমিত হওয়া সত্ত্বেও তা পুনরায় জ্যোতিষ্ক্রিয় এই সত্য মনে রেখে আমরা মানুষের প্রতি আস্থা না হারিয়ে তার প্রকৃত প্রতিভা— সংগত বাস্তব মর্মের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য করে অগ্রসর হতে থাকব।*

বইয়ের ভিতরে ক্রম-মনোনিবেশের মধ্যেই হঠাৎ এক তীব্র বিস্ফোরণে সমস্ত লাইব্রেরি-ঘর কেঁপে উঠল। চারদিকে ইতস্তত ছিটকে পড়ল আলমারি-টেবিল-চেয়ার-বই। অমৃতাভও যেন টলে গিয়েছিল, শুধু বইটা বিশ্বস্ত ধরা ছিল হাতে। লোকজনের শোরগোলের মধ্যে সে হতভম্বের মতো বসে রইল কিছুক্ষণ। একটি যুবক তার হাত ধরে টান দিয়ে বলল, "এখনও বসে আছেন আপনি? পালান শিগগির! দেখছেন না আগুন লেগে গেছে।" মন্ত্রমুগ্ধের মতো অমৃতাভ যুবকটির সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এল। তাড়াহুড়োতে বইটা হাতেই থেকে গেল তার। ইতিমধ্যে বাইরে লোকজনের ভিড় ক্রমশ স্ফীত হয়ে চলেছে। কয়েকজন প্রহরী অমৃতাভদের একটা ফাঁকা জায়গায় নিয়ে দাঁড় করাল। অল্পক্ষণ পরে দমকল আর পুলিশ -বাহিনীও হাজির হলো পর পর। দমকল আসার আগেই অবশ্য লাইব্রেরির কর্মচারীরা আগুনকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছিল। লোকমুখে অমৃতাভরা জানতে পারল, ক্ষয়ক্ষতি হলেও ভিতরের মানুষজনের কোনো গুরুতর আঘাত ঘটেনি। এর মধ্যে পুলিশের এক ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাদের সেই জায়গা ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে নিষেধ করে গেলেন। ওদের নাকি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ আছে। শুনে, অমৃতাভ কেমন অবসন্ন ও হতাশ হয়ে পড়ল। পুলিশের, রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের হাত থেকে তার কি নিষ্কৃতি নেই? বারবার কেনই-বা সে অকুস্থলে গিয়ে পড়ছে, যেখানে থানা-পুলিশের চৌহদ্দির ভিতর অমৃতাভর ভূমিকা অপরিহার্য হয়ে উঠছে?

মৌমিকে ঘিরে কিছুক্ষণ আগের অনুভূতির কথা অমৃতাভর মন থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে এখন বাড়ির কথা মনে হলো। শাশ্বতীকে খুব কাছে পেতে চাইল সে। এই মুহূর্তে শাশ্বতীকে মনে হলো তার জীবনের এক পরমতম আশ্রয় ও শান্তি। শাশ্বতীর গর্ভের ভিতরে যে-বীজ উপ্ত হয়ে আছে, সেই বীজের শিকড়ে অবলম্বন পেতে চাইল। যৌনতাড়নার তীব্রতম মুহূর্তগুলিতেও তো তার বউ বারবার তাকে সেই অবলম্বনই দিয়ে এসেছে! আজ এখন, চতুর্দিকের সন্ত্রাসের ভিতরে হঠাৎ যেন সে আবিষ্কার করে ফেলতে পেরেছে সেই সত্যকে।

"মাঝে মাঝে বুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়, আমি একটা চেয়ারের মতো জড় হয়ে যেতে থাকি।" শাশ্বতীকে বলেছিল অমৃতাভ। একদিন।



"তোমার কথা শুনলে মনে হয় যেন স্বপ্নে বেঁচে আছো। আমার হিংসা হয়।"

"হিংসা?" অমৃতাভ জিজ্ঞাসা ছুঁড়ে দেয় শাশ্বতীকে।

"হ্যাঁ হিংসাই। স্বপ্নের আবেশে কে-না চায় বেঁচে থাকতে? শত চেষ্টা করেও সেইসব স্বপ্নের ভেতর চলে যেতে পারি না আমি, যা আমাকে স্বস্তি ও আরাম দিতে পারে। অথচ তোমার কথা শুনতে শুনতে মনে হয়, তুমি অতি সহজেই বাস্তব আর স্বপ্নের মধ্যে সেতু গড়ে নিতে পার।"

"তাই? কই আমি তো টের পাই না?"

"তোমার তো আক্ষেপ নেই যে টের পাবে!" অমৃতাভ চমকে ওঠে শাশ্বতীর কথায়। নিজের চিন্তার জগৎ থেকে শাশ্বতীর চিন্তার জগতে এসে সে যেন নিজেকে দেখবার সুযোগ পেয়ে যায়।

"তোমার কথা শুনে এখন-যে আমারও হিংসা হচ্ছে!" অমৃতাভ বলল।

"কেন?"

"এত সহজে আমার অনুভূতিগুলিকে তুমি স্পর্শ করতে পারো, এই ভেবে। তোমার মতো সহজে কোনো কথা তো বলতে পারি না আমি। থেকে থেকে হাঁপিয়ে উঠি আর, ক্রমশ জটিল হয়ে যায় আমার সংলাপ।"

"হয়তো জটিল, তবু ভালো লাগে আমার— তোমার স্বপ্নগুলো— আমার গর্ভের ভিতরে আজকাল আমি তার স্পন্দন টের পাই।" শাশ্বতীর কথার অনুভবটুকু পেতে অমৃতাভ খুব সাবধানে ওর পেটের উপরে কান পাতে। শাশ্বতীর মতো সেও কি স্পন্দন টের পেল কোনো?

"কিছু কি শুনতে পাচ্ছ অমৃত?"

"নাঃ, শুধু মনে হলো কী যেন নড়ে গেল। একেই কি প্রাণ বলে, শাশ্বতী?"

"আমিও থেমে থেমে টের পাই এক অবরুদ্ধ নড়াচড়া। মনে হয়, কে যেন বলতে চায় কিছু। অনেক দূরের থেকে দরজায় কড়া নাড়ার মতো আমাকে ব্যস্ত করে তোলে। ভালো করে শুনতে চেষ্টা করো, দেখবে তোমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠবে।" বলে, শাশ্বতী তার গর্ভের ঘনিষ্ঠে টেনে নেয় অমৃতাভকে। অমৃতাভর সমস্ত স্নায়ু ধীরে ধীরে শিথিল হতে থাকে। প্রাণপণে সে চেষ্টা করে অনুভব করতে, কিন্তু কোনোক্রমেই আর ফিরে পায় না তার ইন্দ্রিয়শক্তিকে। যেন ঘুমে ঢুলে পড়ার আগে সে দেখতে পায় এক আয়নার ভিতর থেকে মা বেরিয়ে এসে হাত ধরে তাকে টেনে তুলতে চাইছেন। এক জরাজীর্ণ অন্ধকার বাড়ির গর্ভের অভ্যন্তর থেকে। মায়ের সমস্ত শরীর থেকে চুঁয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা স্বেদবিন্দু আর, সেইসব তার শরীরের উপর ছড়িয়ে পড়েছে আলোকণার মতো হয়ে। আলোর সেই কণিকাগুলির দিকে অগ্রসর হতে হতে সে

দেখতে পেল ক্লান্ত, অবসন্ন, নগ্ন এক নারী-মাতৃদেহ আয়না বিচূর্ণ করে চলে যাচ্ছে গভীর থেকে গভীরতর প্রতিবিম্বের ছাঁচ ভেঙে ভেঙে। অবশেষে আয়নার সেই কাচগুলো জুড়ে গিয়ে অমৃতাভ শাশ্বতীকেও নড়ে যেতে দেখল।

ঠিক এমন সময় একজন কনস্টেবল গোছের লোক এসে ডাকল তাকে। যেন বহুকালের ঘুম থেকে জেগে উঠল অমৃতাভ। লোকটার পিছন পিছন একটা হলঘরে এসে ঢুকল। দেখল, সেখানে একজন হোমরাচোমরা লোক টেবিলের উলটোদিকে বসে অন্য-একজনের সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলছে। তাকে সামনে এগিয়ে আসতে দেখে বসতে অনুরোধ জানাল। অমৃতাভ নমস্কার করে টেবিলের এপারে একখানা চেয়ারে বসতে বসতে টের পেল এখনও তার হাতে জীবনানন্দের বইখানি ধরা আছে। বইটি টেবিলে রাখতে রাখতে বলল— "মাফ করবেন, এই বইটা লাইব্রেরির। তাড়াহুড়োতে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম। এটা দয়া করে লাইব্রেরিতে ফেরত পাঠালে খুশি হব।"

"নিশ্চই।" ভদ্রলোক তার পাশে-বসা এক ব্যক্তির হাতে বইটি তুলে দিলেন। "প্লিজ, আপনার নাম, বয়স, পেশা, ঠিকানা এবং টেলিফোন থাকলে নম্বরটা এই কাগজে লিখে দিন।" বলে, একটা ছোটো রাইটিং প্যাড এগিয়ে ধরলেন তিনি। লেখা শেষ হলে প্যাডটা হাতে নিয়ে বললেন, "আপনি কি প্রায়ই আসেন এখানে?"

"হ্যাঁ।"

"আজ ক-টার সময় আসেন?"

"দুপুর তিনটে হবে।"

"একটু ভেবে বলুন তো, কোনো সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়েছিল আপনার?"

"না।"

"লাইব্রেরি থেকে একবারের জন্যও কি আপনি বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"বাথরুমে।"

"বাথরুমে? বাথরুমের ভিতরেই তো বিস্ফোরণটা ঘটে। ঠিক ক-টার সময় গিয়েছিলেন সেখানে?"

"ঠিক ঠিক বলতে পারব না, তবে চারটের আগে নয়।"

"কী করে নিশ্চিত হচ্ছেন?"

"বাথরুম যাবার আগে আমি চারটে বাজার ঘণ্টা শুনেছিলাম।"

"বাথরুমে কি আপনি কাউকে দেখতে পেয়েছিলেন?"

"না। তবে ল্যাট্রিনের ভিতর জলের শব্দ শুনেছিলাম।"



"কতক্ষণ ছিলেন বাথরুমের ভিতর?"

"মিনিট পাঁচেক তো হবেই।"

"সেই সময়ের ভিতর কেউ ল্যাট্রিন থেকে বেরোয়নি?"

"না।"

"ভালো করে মনে করুন। কেননা যে-বাথরুমের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল, আপনিও সেই বাথরুমে গিয়েছিলেন।"

"কিন্তু আমি কী করব। সত্যি সত্যিই আমার সঙ্গে কারো দেখা হয়নি।"

"সন্দেহজনক কিছু পড়ে থাকতে দেখেছিলেন? আরো ভালো করে মনে করুন। আপনার জবাবের উপর নির্ভর করে আমরা হয়তো একটা ঘৃণ্য সন্ত্রাসবাদী দলকে ধরে ফেলতে পারব।"

এতক্ষণ অমৃতাভ তার উত্তরগুলো বেশ ধৈর্যের সঙ্গে এবং যথেষ্ট চিন্তাভাবনা করেই দিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু অফিসারের বারংবার নাছোড় প্রশ্নের কারণে সে বেশ বিরক্ত হয়ে উঠল, কেমন যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলল।

"আমি খুব ভেবেই বলছি স্যার, এমন কিছু দেখিনি বা শুনিনি যা আপনাদের বলতে পারি।"

"আপনি মনে হয় অধৈর্য হয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভেবে দেখুন, আমরা জানতে না চাইলে আপনি কি নিজের থেকে এসে ল্যাট্রিনের ভেতরে জলের শব্দের কথা জানাতেন? বোঝা কি যাচ্ছে না ওই সময় আপনি ছাড়াও বাথরুমে অন্য কেউ একজন ছিল, যে প্রকাশ্যে আসতে চায়নি।"

"কিন্তু সে তো আপনার অনুমানও হতে পারে। ল্যাট্রিনের কল অসাবধানে খোলাও তো থাকতে পারে।"

"খুব পারে। তবু ল্যাট্রিনের ভিতরেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল; এবং যেহেতু সেখানে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যার থেকে তদন্ত সহজ হতে পারে, তাই আপনার সাক্ষ্য ও বিবরণ আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। বোধ করি রাষ্ট্রের স্বার্থে এটুকু সহযোগিতা আমরা আপনার কাছে আশা করতে পারি। আপনি নিশ্চয়ই সন্ত্রাসবাদীদের সাহায্য করতে চাইবেন না।" শেষের কথাটায় অমৃতাভ স্বভাবতই বিচলিত হয়ে পড়ল। অফিসারের কথার চালে চৌকশ ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের ভাব তাকে বিমূঢ় করে দিল। যত অস্বস্তিই হোক, সে যেন কিছুটা সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। ভদ্রলোক নিজে থেকে মুক্তি না দিলে অমৃতাভর যেন রেহাই নেই। আত্মসমর্পণে বাধ্য সে।

"না, মানে— আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাইনি। আমি যা বলেছি তা সত্য, অনুমান নয়। কাকতালীয়ভাবেই আমি সেই সময় বাথরুমে গিয়েছিলাম। ঠিক জানি না কেন আমার শরীর গুলিয়ে গিয়েছিল, কেন হঠাৎ বমি হয়ে গিয়েছিল সব! বিশ্বাস করুন।"

"আমরা আপনার প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করি। আচ্ছা, আপনার ওই কাঁধের ব্যাগে কী আছে?" প্রশ্ন শুনে আপনিই অমৃতাভ ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল।

"একটা ডায়রি। গুটিকয় পত্রপত্রিকা। একটা ছাতা আর পেন।"

"আমাকে সেগুলো দেখতে দেবেন?"

"নিশ্চই।" অমৃতাভ অফিসারের দিকে ব্যাগটা এগিয়ে ধরল। ব্যাগের ভিতর থেকে জিনিসগুলো বের করে ভদ্রলোক টেবিলে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর ডায়রিটা কিছুক্ষণ উলটে পালটে দেখলেন। ছাতা আর পেনটা অমৃতাভর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন— "বাকিগুলো আমরা রেখে দিচ্ছি। আপনি লালবাজারের গোয়েন্দা দপ্তর থেকে দিন দশেক পরে ফেরত নিয়ে নেবেন।"

"ডায়রির লেখাগুলো ভীষণই ব্যক্তিগত, স্যার। আমি চাই না সেসব অন্য কেউ পড়ুক।"

"ভয় নেই, এগুলোকে বাজেয়াপ্ত করছি না আমরা। কিছুদিনের জন্য গচ্ছিত রাখছি মাত্র। আপনাকে আমরা সেই মর্মে একটা রসিদও লিখে দেব। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কারণে এটুকু সহযোগিতা আপনার কাছে আমরা দাবি করতে পারি নিশ্চয়ই।" বলে, তিনি তার অধস্তন এক অফিসারকে রসিদ তৈরি করে দেবার নির্দেশ দিলেন।

"কিন্তু এই ডায়রির সঙ্গে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার কী যোগ আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। লেখাগুলো একটু পড়লেই আপনার বুঝতে অসুবিধা হবে না, ওগুলো আমার একান্ত ব্যক্তিগত চিন্তাভাবনার নোটস্।" লেখাগুলো নিয়ে অমৃতাভ একটু বেশিই বিচলিত, কারণ ওইসব লেখা তার নিত্য সঙ্গীর মতো। তাছাড়া বেশ কিছু কবিতা ও গদ্য রচনার খসড়াও রয়েছে যেগুলো কাছ-ছাড়া করতে খুব কষ্ট হচ্ছিল। আরো কষ্ট হচ্ছিল এই ভেবে যে, প্রশাসনিক নিয়মরীতি রাষ্ট্রের শান্তির নামে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছাগুলোকেও সাধারণ্য করে তুলতে চাইছে।

"আপনি খামোকা বিচলিত হচ্ছেন। তদন্তের কারণে আমাদের এটুকু করতেই হবে। আপনি এখন যেতে পারেন। তবে ভবিষ্যতে কোনো প্রয়োজনে আপনাকে আমরা ডেকে পাঠাতে পারি বা আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি। নমস্কার।" অফিসারের কথার মধ্যে বিনয়ের পরিবর্তে একটা নির্দেশাত্মক ভঙ্গিমা ফুটে উঠল যেন। অমৃতাভ বুঝল তার পক্ষে এখন আর কোনো কথা বলার অর্থই হলো রাষ্ট্রদ্রোহিতা। অতএব সেও নমস্কার জানিয়ে লাইব্রেরির সেই গম্বুজের থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল পথের উপর। এক লহমায় অনেক মানুষ ঘিরে ধরল তাকে। টিভি ক্যামেরা, সাংবাদিকের দল মিলে অসংখ্য প্রশ্নে জর্জরিত করে তুলল। প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত উত্তর দিয়ে সরে পড়তে চাইল সে।

"আপনার নাম?"



"অমৃতাভ সেন।"

"বিস্ফোরণের সময় ভিতরে কী করছিলেন?"

"বই পড়ছিলাম।"

"ঠিক কোথায় ফেটেছিল বোমাটা?"

"বাথরুমে।"

"কারো কোনো আঘাত—"

"ঠিক বলতে পারব না।"

"কখন থেকে আপনি লাইব্রেরিতে ছিলেন?"

"দুপুর থেকে।"

"সন্দেহজনক কিছু কি চোখে পড়েছিল তখন?"

"না।"

"কোনো মুখোশ-পরা লোক বা লিফলেট জাতীয়..."

"এসবের কিছুই জানি না আমি। শুধু চোখের সামনে দেখলাম আলমারি, চেয়ার টেবিল ছিটকে পড়ল। অনেক বই পুড়ে গেল। ব্যস, এর থেকে বেশি কিছু দেখিনি। ভীষণ ক্লান্ত, বিধ্বস্ত আমি। আমাকে যেতে দিন প্লিজ।" প্রায় ছুটে সে বাসস্ট্যান্ডে চলে এল। কিন্তু সেখানেও পথচলতি মানুষের আগ্রহের থেকে রেহাই মিলল না। বোমা বা রাষ্ট্রের সন্ত্রাসের চেয়েও এই মুহূর্তে উৎসুক প্রশ্নের ত্রাস তাকে অনেক বেশি বিপর্যস্ত করে তুলেছে যেন।

"দাদা কি লাইব্রেরির দিক থেকে আসছেন?"

"হ্যাঁ।"

"শুনলুম, পাকিস্তানের জঙ্গিরা নাকি বোমা মেরে ভেঙে ফেলেছে লাইব্রেরির একটা অংশ?"

"আমি তো ওখান থেকেই এলাম। তেমন কিছু তো শুনলাম না।"

"আপনি লাইব্রেরিতেই ছিলেন?"

"হ্যাঁ।"

"তবে যে একটু আগে আর-একজন আপনারই মতো লাইব্রেরির থেকে এসে বললেন, বিস্ফোরণে অনেকে হতাহত হয়েছেন!"

"কই? না তো? শুধু কিছু বই পুড়ে গেছে। দু-একটা ঘরের আসবাব, জানালা-দরজা-দেয়াল ফেটে গেছে। এর বেশি কিছু নয়!"

"ধুস, বোমাটা তাহলে অর্ডিনারি হবে!"

"হবেও-বা। আপনারা একটু এগিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন না!"

"মাথা খারাপ নাকি মশাই? পুলিশে ধরে জেলে পুরে দিক আর কী! ফালতু

আগ্রহ দেখিয়ে উটকো ঝামেলায় কী লাভ!"

"ঠিকই তো। শুনছিলাম, পুলিশ কিছুক্ষণের মধ্যে এদিকেও আসবে। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই অ্যারেস্ট করবার ওয়ারেন্টও বেরিয়ে গেছে।" কথাগুলো শেষ হতেই অমৃতাভ দেখল ভিড় পাতলা হয়ে আসছে। সহজেই তখন ভিড় ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারল সে আর, তক্ষুনি শিয়ালদহ যাবার ২২৩ বাসটাও পেয়ে গেল। বাসে যদিও লোকজনের সংখ্যা কম, তবু সেখানেও বিচিত্র আগ্রহের মুখোমুখি হতে হলো তাকে।

"দাদা কি লাইব্রেরির দিক থেকে এলেন?"

"না তো!" এবার অস্বীকার করল অমৃতাভ।

"শুনলাম, লাইব্রেরিতে গ্রেনেড ফেটেছে?"

"তাই নাকি?" সে না জানার ভান করল।

"শোনেননি? বেশ ক-জন তো মারাও গিয়েছে।" অমৃতাভর পাশে-বসা লোকটি খবরটা তাকে শোনানোর জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল।

"ইশ্‌শ্‌! তাই বুঝি?"

"মিলিটারি শাসন ছাড়া এইসব পাকিস্তানিদের ঠান্ডা করা যাবে না, বুঝলেন মশাই।" উলটো দিকের সিট বলে উঠলেন।

"তাহলে কাশ্মীরে প্রতিদিন এত খুনোখুনি কেন?" ইচ্ছা করেই লোকটাকে ঠেস দিতে চাইল সে।

"সে মশাই ভিতরে ভিতরে বোঝাপড়া আছে।"

"বোঝাপড়া থাকলে আর মিলিটারি শাসনের কী দরকার?"

"ঠিক। আমাদের মতো আদার ব্যাপারীর জাহাজের খোঁজে কী লাভ?" বাসের কোণ থেকে বলে উঠলেন টাই-পরা এক ভদ্রলোক।

"মরতে যে আমাদেরই হয়!" ওর পাশের লোকটি বললেন।

"টিকিট?" গুরুগম্ভীর আলোচনায় জল ঢেলে কন্ডাকটর লোকটির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। অমৃতাভ সেই অবসরে বাসের ভিতর থেকে রাস্তার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। অতঃপর বাসের ভিতরকার সার্বজনীন সভা ভেঙে গিয়ে ছোটো ছোটো সভা সৃষ্টি হতে থাকল— পাশাপাশি-বসা লোকেদের মুখে মুখে। অমৃতাভর পাশের মধ্যবয়সি লোকটি কাউকে না পেয়ে আপনমনেই বলে উঠলেন, "এ-দেশের যুবকেরা স্বার্থপরতা না ছাড়লে এমন আরো ঘটতেই থাকবে।" ভদ্রলোকের লক্ষ্য যে সে-ই, তা ভেবে অমৃতাভর হাসি পেল খুব।

বাড়ি ফেরা অবধি সে আর কারো সঙ্গে কথা বলেনি। এমনকি, বাড়িতে ফিরে ভেবেছিল শাশ্বতীকে বলবে সবকিছু, কিন্তু শাশ্বতী ঘুমিয়ে থাকায় তার আর ইচ্ছা করেনি জোর করে সেসব শোনাতে। বাড়ির নিশ্চিন্ততায় ফিরেও তবু অস্থিরতা কাটছিল



না। কেমন যেন এক আনচান ভাব শরীরে কাঁটার মতো বিঁধছিল। সে বেশ বুঝতে পারছিল, সারাদিনের ধকল তাকে শুধু অবসন্নই করে তোলেনি, একান্ত ব্যক্তিগত লেখা ও কবিতাগুলো হাতছাড়া হওয়ায় তার মানসিক অবস্থা ক্রমশ নিরালম্ব হয়ে পড়েছে। মনে পড়ে গেল, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টেলিফোন নম্বর আর ঠিকানাও ছিল ডায়রিতে। খুব শিগগিরই সেইসব ঠিকানায় যাবারও কথা ছিল। ঠিকানাগুলোকে অতি যত্নে লিখে রেখেছিল সে, কারণ অনেক কষ্ট করে জোগাড় করতে হয়েছিল। কিছু মানুষের সাক্ষাৎ জরুরি ছিল। কোনো কোনো গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রয়োজন ও তাগিদ ছিল গভীর। এখন সেইসব হাতছাড়া হয়ে পড়ায় সে এমন অস্থির হয়ে উঠেছে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে, ভবিষ্যতে কোনোদিন কি আর ওইসব ঠিকানা- গুলোতে পৌঁছাতে পারবে সে? হারিয়ে-যাওয়া সময়, হারানো ঘরবাড়ি, হারানো সম্পর্ক কি সত্যিই আগের মতো একই প্রয়োজন দিয়ে ফিরে পাওয়া যায়? নাকি ভবিষ্যতের কোনো নতুন সময়ে ইচ্ছেরা এসে সেসব কখনো ফের ফিরে পেতে চাইবে?

**পুনশ্চ**

তিন-চার মাসের ক্রমাগত টানাপোড়েন ও নাছোড় উদ্যোগের পর অমৃতাভ তার ডায়রি ও পত্রপত্রিকাগুলিকে ফেরত পেয়েছিল। যদিও এই তিন-চার মাসে পুলিশ তাকে নতুন করে জিজ্ঞাসাবাদ করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। এই তিন-চার মাস সে লাইব্রেরিতেও যায়নি আর। এমনকি, আর কোনোদিনই সেই লাইব্রেরিতে যাওয়া হয়ে ওঠেনি তার। অফিস-লালবাজার-বাড়ি— এই ছিল রুটিন। কোনো বই পড়েনি। লেখেনি কোনো কবিতা। পীড়াগ্রস্তের মতো কেটেছিল দিনগুলো। অবশেষে ডায়রি ফেরত পাবার পর যখন সে দেখল তার বেশ কিছু পৃষ্ঠা পোকা আর ইঁদুরে কেটে ফেলেছে, এমনকি কয়েকটি পৃষ্ঠা লোপাট, সেইসঙ্গে বেশ কিছু লেখা পাঠযোগ্যও নেই আর, খুব ভেঙে পড়েছিল সে; সোচ্চারে প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল। চেয়েছিল সেই অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে। কিন্তু ভদ্রলোক বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন পুরুলিয়া। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার নামে পুলিশি প্রশাসন, কত সহজে অমৃতাভর জীবনের এই তিন-চার মাস সময়কে অস্থির আর অস্বস্তিকর করে তুলেছিল। নিহিত এই সন্ত্রাসের কি তদন্ত আছে কোনো? অভিযোগ জানানোর পুলিশ স্টেশন?

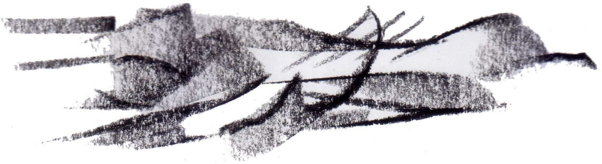

## আজ তুমি লিখে রাখো নাম যেখানে মায়ের আঁচল

মা হলো শাশ্বতী। পুত্র সন্তান।

হাসপাতালের করিডোরে অপেক্ষমাণ অমৃতাভর কাছে ওয়ার্ডবয় যখন খবরটা পৌঁছে দিল, তখন কী করবে, অর্থাৎ ঠিক কী কী করা সমীচীন, তা বুঝেই উঠতে পারল না সে। হতভম্বের মতো চেয়ে রইল ওয়ার্ডবয়ের দিকে। তারপর চটকা ভাঙতেই তড়িঘড়ি শাশ্বতী যে-ওয়ার্ডে ভর্তি, সেদিকে যেতে নিল। ওয়ার্ডবয় বলল, "এখনও বেড়ে দেয়নি সার। লেবাররুম থেকে খপর নিয়ে আসচি। একটু অপেক্ষা করেন। মাসি খপরখান দেতেই ছুট্টে এলম। খুশি হয়েচেন তো সার?"

খুশি? হ্যাঁ, খুশি। খুশিই তো। মাথা নাড়ল অমৃতাভ। কিন্তু তার ভাবে-ভঙ্গিমায় কোথায় যেন সেই খুশি উন্মুক্ত হতে পারছিল না।

"কখন বেড়ে দেবে জান ভাই?" জিজ্ঞাসা করল অমৃতাভ।

"ঘণ্টা খানেক পরে।"

"আর কিছু বলবে আমাকে?"

"হ্যাঁ। মাসি বললে, বাচ্চার জামাকাপড়, মায়ের জন্য শাড়ি, বিস্কুট, হরলিক্স নে আসতে।"

"আচ্ছা।" বলে, অমৃতাভ যাবার জন্য উদ্যত হলো।

"সার—" ওয়ার্ডবয়ের পিছুডাকে থেমে গেল সে।

"এত ভালো একটা খপর দিলম, বকসিস দিবেন না?"

একটা দশ টাকার নোট অমৃতাভ তার হাতে ধরিয়ে দিল। খবরের দাম।

"বেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ো কিন্তু।" দশ টাকার বকশিশের বিনিময়ে সে আরো উপ্‌রি কিছু পেতে চাইল।

"নিচ্চই সার।" ওয়ার্ডবয় চলে গেলে অমৃতাভ হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে ছেলের জন্য দুটো করে হালকা-পাতলা জামা-প্যান্ট, বউয়ের জন্য আটপৌরে শাড়ি-ব্লাউজ-সায়া, হরলিক্স, মিষ্টি আর আপেল-কলা কিনল। নিজেও খেয়ে নিল কিছু। তারপর একটা



দামি কিংসাইজ সিগারেট শেষ করে হাসপাতালের করিডোরের পুরোনো জায়গায় এসে বসল। মাথার মধ্যে তখন তার যত অগোছালো সব চিন্তা এসে ভিড় করতে থাকল। ভিতরের থেকে নতুন কোনো খবর না আসাতে হঠাৎ মনে হলো, আচ্ছা, ওয়ার্ডবয় তাকে চিনল কী করে? অন্যের খবর ভুল করে বলে গেল না তো ছেলেটা? শাশ্বতী ভালো আছে তো? এমন সময় একটি কমবয়সি মেয়ে এসে বসল তার পাশে। বয়স পনেরো-ষোলো হবে। সদ্য যৌবনের অহংকার প্রকাশ পাচ্ছে সর্বাঙ্গ জুড়ে। অমৃতাভ আড়ষ্ট হয়ে এল ভিতরে ভিতরে। মেয়েটি হুট করে জিজ্ঞাসা করল তাকে, "কটা বাজে?"

"দুটো দশ।" ঘড়ি দেখে উত্তর দিল অমৃতাভ।

"কেউ মল্লিকা ঘোষের খোঁজ করছিল কি-না, বলতে পারেন?"

"আমি কিছুক্ষণ বাইরে ছিলাম। ঠিক ঠিক বলতে পারব না।" কিছু সময়ের নীরবতার পর অমৃতাভ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল— "মল্লিকা ঘোষ তোমার কে হন?"

"আমার মা।"

"কী অসুখ মায়ের?"

"অসুখ হবে কেন? বাচ্চা হবে।" সহজভাবেই উত্তর দিল মেয়েটি। কোনো জড়তা ছাড়াই।

"ও।" অমৃতাভ অপ্রস্তুত হয়ে গেল।

"আপনার কি স্ত্রী ভর্তি আছেন? কোনো খবর পেয়েছেন তাঁর?"

"হ্যাঁ। ছেলে হয়েছে।"

"মল্লিকা ঘোষের কি কেউ আচেন এখেনে?" ওয়ার্ডবয়ের চিৎকারে দুজনের ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত ছিন্ন হয়ে গেল। মেয়েটি সাড়া দিয়ে এগিয়ে গেল সামনে। অমৃতাভও পিছন পিছন এগিয়ে চলল ওয়ার্ডবয়ের দিকে।

"কী হয়েছে?" মেয়েটি সরাসরি প্রশ্ন করল।

"ছেলে।" খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। ওয়ার্ডবয় বকশিশ চাইবার আগে অমৃতাভ ওকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল— "আমার পেশেন্টকে কি বেড়ে দিয়েছে ভাই?"

"ও, আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি এখন দেখতে যেতে পারেন। জিনিসগুলো সব এনেচেন তো? আমাদের মাসির আবার বেহুদ্দ মেজাজ। ওগুনো নিয়ে না গেলে আমাকে গালাগাল দিয়ে আস্ত রাকবে নাকো। আপনেদের ভুল হলেও কিচুতে বিশ্বেস করবে না যে, আমি সবকিচু ঠিক ঠিকই বলিচি।"

"মেয়েটি ঘুরে দাঁড়িয়ে অমৃতাভর দিকে তাকিয়ে বলে উঠল— "শুনছেন দাদা, আমার ভাই হয়েছে। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন।"

"তোমরা ক'ভাই-বোন?"

"এতদিন একলা ছিলাম। এখন দুজন।"

"তাই বুঝি?"

"আমার মাকেও কি বেডে দিয়েছে?" ঘুরে ওয়ার্ডবয়কে জিজ্ঞাসা করল ও।

"হ্যাঁ। তুমিও যাও-না কেনে উনার সঙ্গে। তবে যাবার আগে কিন্তুক আমার বকসিস দিয়ে যেতি ভুলোনি।" মেয়েটি তখন পাঁচ টাকার নোট গুঁজে দিল ছেলেটির হাতে।

"মাত্তর পাঁচ?"

"এর বেশি যে নেই আমার কাছে।" এই বলে ও অমৃতাভর হাত ধরে টান দিলে, "কী হলো? দাঁড়িয়ে আছেন যে! চলুন শিগগিরি।"

"অ্যাঁ? হ্যাঁ, চলো।" অমৃতাভ অবাক হয়ে যাচ্ছিল ওর উৎসাহ দেখে। ভাবল, যেখানে সে এখনও পিতৃত্বের গৌরব উপলব্ধি করতে পারছে না সেখানে মেয়েটি যেন তার ভাইয়ের মধ্যে মাতৃত্বকে অনুভব করতে পেরেছে! সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে অমৃতাভ জেনে গেল ও এবার মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। ওর বাবা ব্যাংকে সিকিউরিটি গার্ডের চাকরি করেন আর, মা প্রাইমারি স্কুলে। ওয়ার্ডে ঢুকে অমৃতাভ শাশ্বতীকে খুঁজতে লাগল। দেখল পাঁচটা বেডের পরেই শুয়ে আছে ও। ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল সেদিকে। এতক্ষণে তার বুকের মধ্যে যেন একটা কিছুর স্পন্দন অনুভব করতে পারল সে। এক অজানা আনন্দের শিহরন। দেখল, শাশ্বতী আর সদ্যোজাত শিশুটি পাশাপাশি শুয়ে আছে। শিশুটিকে অমৃতাভর মনে হলো যেন একটা মাংসপিণ্ড— হাত-পা-চোখ-কান-নাক-মুখ নিয়ে প্রাণবৎ পড়ে আছে। সরু সরু হাত-পা নিয়ে সরীসৃপের মতো শুয়ে, অথচ সরীসৃপের মতো নিস্তেজ হয়ে নয়; অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একটু একটু নড়েই চলেছে। কোমরে ২২ নম্বর লেখা একটা চাকতিও লক্ষ করল সে।

"কই, কাপড়-জামা এনেছেন?" ওয়ার্ডবয় যাকে মাসি বলে উল্লেখ করেছিল সম্ভবত ইনিই সেই মহিলা।

"হ্যাঁ। এই নিন।" কাপড়ের প্যাকেটটা এগিয়ে ধরল অমৃতাভ।

"আপনি বাচ্চার কাছে বসুন। আমি মাকে কাপড়-জামা বদলিয়ে আনছি।" শাশ্বতীকে সঙ্গে নিয়ে মহিলা বাথরুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ওদের চলে-যাওয়ার দিকে তাকিয়ে সে লক্ষ করল, ঠিক একটা বেডের পরেই ষোড়শী সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। কোনোরকমে শরীর এলিয়ে সেই বেডের মহিলা অমৃতাভর সন্তানেরই মতো একটি অবিকল মাংসল পিণ্ডকে বুকে জড়িয়ে আধশোয়া হয়ে আছেন। চোখাচোখি হতেই মেয়েটি অমৃতাভর কাছে এগিয়ে এল: "এই বুঝি আপনার ছেলে? কী সুন্দর!"

"সুন্দর?" অবাক হলো অমৃতাভ। "এই মাংসের পিণ্ডটাকে তোমার সুন্দর লাগছে?"



"সুন্দর নয়? দেখুন তো কেমন দু-চোখ ভরে চেয়ে আছে! বিস্ময়ে।"

বিস্ময়! শব্দটার প্রয়োগে অমৃতাভর ঘোর লাগে। বয়সে অনেক ছোটো হলেও ওর প্রতি সম্ভ্রম জেগে ওঠে। কিশোর-উত্তীর্ণা এই মেয়েটির রূপলাবণ্য থেকে হঠাৎ যেন এক পুণ্য আবেশ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। ওকে করে তুলেছে পবিত্র, সমাহিত।

ঠিক তখনই অমৃতাভর ছেলে কেঁদে উঠল। মেয়েটি কাছে গিয়ে মুখ থেকে নানারকম শব্দ তৈরি করতে থাকল। তবু কান্না থামছে না দেখে ও বলল, "মনে হয় খিদে পেয়েছে।" অমৃতাভ অস্থির হয়ে পড়ল। কী করা যায়। শাশ্বতীর দেরি হচ্ছে কেন? "চিন্তা নেই। বৌদির কোল পেলেই দেখবেন এক্কেবারে ঠান্ডা। দেখেছেন, কাঁদলেও কী সুন্দর!" মেয়েটি আশ্বস্ত করতে থাকে। ওর প্রাণশক্তি, উচ্ছলতা ক্রমাগত মুগ্ধ করে দেয় অমৃতাভকে। জীবনকে কত সহজেই-না ছুঁতে জানে ও। মনে মনে তাই ওর নাম দিল 'আনন্দী'। এই সময় দেখতে পেল মাসির হাত ধরে এগিয়ে আসছে শাশ্বতী। বিছানায় বসে ও আলগোছে ছেলেকে কোলে তুলে নিল। মাসি বললেন, "দুধ দেবার আগে তুলো ভিজিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করে নাও। বাচ্চার ইনফেকশন হতে পারে।" মাসির নির্দেশ পালন করে শাশ্বতী পরম নিশ্চিন্ততায় ছেলের মুখে তার স্তনের বোঁটা গুঁজে দিল! শিশুটি কান্না থামিয়ে দুধ খেতে খেতে হয়তো ঘুমিয়েই পড়ল। শাশ্বতী তখন আনন্দীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি মল্লিকাদির মেয়ে?"

"হ্যাঁ।"

"মল্লিকাদির মুখে তোমার কথা অনেক শুনেছি।"

"খুব প্রশংসা করেছেন, না? আসলে মা আমাকে খুব ভালোবাসেন তো! প্রশ্রয়ও দেন খুব।"

"না না, তুমি সত্যিই খুব ভালো মেয়ে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা! এখন দাদার সঙ্গে কথা বলো। পরে গল্প করব। আমি মার কাছে যাই।"

আনন্দী চলে যেতে শাশ্বতীর কিছুটা নিকটবর্তী হতে পারল অমৃতাভ।

"জানো, মেয়েটি মল্লিকাদির সৎ মেয়ে? জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই ওর মা মারা যান। মল্লিকাদি আর ওর বাবা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতেন। মা-মরা-মেয়েটির প্রতি মায়ায় ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়েন মল্লিকাদি। তারপর ভদ্রলোকের সঙ্গেও। মেয়ে যখন চার বছরের, তখন স্কুলে চাকরি পান উনি— কিন্তু কলকাতার বাইরে। মেয়েটির উপর অপরিসীম মায়ার টানাপোড়েনে শেষপর্যন্ত মল্লিকাদি ভদ্রলোককে বিয়ে করেন। মেয়ের জন্য ঠিক করেন আর-কোনো সন্তানের চেষ্টা করবেন না ওঁরা। কিন্তু মেয়েটি বড়ো হয়ে সব বুঝতে পারে। নেহাত ওরই উৎসাহে মল্লিকাদির এই সন্তান।"

শাশ্বতীর মুখে সমস্ত ঘটনা শুনতে শুনতে অমৃতাভর কেমন গল্পের মতো মনে হলো। আনন্দী আর মল্লিকাদিকে মনে হলো যেন ওঁরা ইহজগতের নয়। রক্তমাংসের হয়েও স্বপ্নলোকের বাসিন্দা। মা-মেয়ের সম্পর্ক নিয়েও ওঁরা পরস্পর যমজ দুটি বোন।

"সত্যিই অবাক হতে হয়। বিশেষ করে মেয়েটাকে দেখে। এই বয়সেই কী গভীর জীবনবোধ! সকল ইচ্ছায় ও কাজে শুধুই আনন্দময়। মনে মনে আমি তাই ওর নাম দিয়েছি— আনন্দী।" অমৃতাভ বলল।

"আমার ছেলের কী নাম দেবে? আনন্দ?" শাশ্বতী জিজ্ঞাসা করে।

"এখনও ঠিক করিনি কিছু।"

"তবু?"

"ভেবেছিলাম মেয়ে হবে, আর তার নাম রাখব মনমিতা। কিন্তু ছেলে হয়েছে, একটু তো ভাবতে হবে!"

"আমার না খুব ভয় হয়েছিল! কী কষ্ট! বড্ড জ্বালিয়েছে তোমার ছেলে। আস্ত শয়তান!"

"আমারই মতো, কী বলো।"

"হ্যাঁ।"

"বেশ। তাহলে ওর নাম দেয়া যাক স্যাটার্ন।"

"ছিঃ! ওর নাম হবে শতদ্রু।"

"বাঃ, খুব সুন্দর। শতদ্রু সেন। তুমি কি আগে থেকেই ভেবে রেখেছিলে নামটা?"

"আচ্ছা অমৃত, শতদ্রুকে পেয়ে ঠিক কী অনুভূতি হচ্ছে তোমার?"

"মনে হচ্ছে, বেঁচে থাকার এত আনন্দ! জন্মান্তরেও বুঝি শেষ নেই তার! যেন প্রসারিত হয়ে গেছি আমি। মনে হচ্ছে, ওই চোখ, ওই মুখ, ওই হাত, ওই পা— কিভাবে সম্ভব হলো? তোমার গর্ভ জুড়ে বীজটি এতগুলো দিন তিল তিল প্রতীক্ষা করেছে শুধু কি এই পৃথিবীর জল-স্থল আলো-অন্ধকার আকাশ-বাতাসের জন্য? প্রায় দশ মাস সময়ের দীর্ঘ ব্যবধান জুড়ে তুমিও-বা কিভাবে অপেক্ষা করে থেকেছ ওর জন্য? তোমার শরীর থেকে এই-যে ছিন্ন হয়ে গেল চিরকালীন, তার কি কিছুমাত্র লেশ ভবিষ্যতেও থেকে যাবে তোমার দেহে-মনে?"

"জানি না। তবে, নিজেকে বেশ ভারমুক্ত লাগছে আজ।"

অতঃপর দুজনেই চুপ করে গেল। আর কোনো কথা নেই যেন ওদের। ফুরিয়ে গিয়েছে ভাব। অমৃতাভ বললে, "ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলে আসি। জেনে আসি, কবে ছাড়বে তোমাকে। একবার আনন্দীর ভাইকেও দেখে যাই। কী বলো?"



প্রায় আধঘণ্টা পরে ফিরে এল সে। শাশ্বতীকে বলল, "ডাক্তারবাবু কাল সকালেই তোমাকে রিলিজ করে দেবেন।"

"তুমি বাড়ি যাবে না? সেই ভোর থেকে তো রয়েছ এখানে। খেয়েছ কিছু?" শাশ্বতী জানতে চাইল।

"যাব। কিন্তু মাসিকে দেখছি না যে? যাবার আগে কোনো কিছুর দরকার আছে কি-না—"

"ওই তো! মা-সি।" ডাক দেয় শাশ্বতী। সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন উনি।

"ডাক্তারবাবু বলেছেন কাল সকালবেলাই ছেড়ে দেবেন ওকে। রাতের জন্য আপনি অবশ্যই অ্যাটেনডেন্টের ব্যবস্থা করে যাবেন। টাকাপয়সা সব কাল মিটিয়ে দেব। আগামীকাল ওকে রিলিজ করার সময় আপনি অবশ্যই থাকবেন। আমি এখন চলে যাব। কিন্তু যাবার আগে যদি কোনো-কিছুর দরকার থাকে তো বলুন।"

"একটা অয়েল ক্লথ আর ওষুধপত্তরগুলো এনে দিলেই হবে।"

"আর কিছু?"

"না, আর কিছু লাগবে না।"

অমৃতাভ অয়েল ক্লথ, ওষুধ কিনে দিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে পড়ল। বাড়ি ফিরতে ফিরতে সন্ধে হয়ে এল। এরই মধ্যে অবশ্য সে ফোন করে জানিয়ে দিয়েছিল, ওদের ছেলে হয়েছে। বাড়িতে ঢুকে দেখল, সেখানে খুশির হুল্লোড়। বাবা তো জড়িয়েই ধরলেন তাকে, "বহুদিন পরে এ-বাড়িতে এক সদ্যোজাতর আবির্ভাব হলো— সেন বংশের উত্তরাধিকার।" মা জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন হয়েছে রে দেখতে? আমার মতো কালো, না তোর বাবার মতো ফরসা?" "কী জানি?" সংক্ষিপ্ত জবাব দিল সে। "খাবারদাবার কিছু আছে? আমি একেবারে খেয়ে শুয়ে পড়ব। কালই সকাল সকাল ছেড়ে দেবে শাশ্বতীকে।"

"এই মিষ্টিটা খেয়ে নে আগে। তোর বাবা নিয়ে এসেছেন। তারপর হাত-পা ধুয়ে আয়, ভাত বেড়ে দিচ্ছি, খেয়ে শুয়ে পড়।" মা তার মুখে গোটা রসোগোল্লা পুরে দিলেন।

শুয়ে শুয়ে হঠাৎ তার চোখের সামনে ভেসে উঠল শতদ্রুর কোমরে বেঁধে-দেয়া ২২ নম্বরের চাকতি। ধীরে ধীরে নানা সংখ্যা মস্তিষ্কের ভিতরে যেন ঘুরপাক খেতে থাকল। তার জীবন জুড়ে সেইসব সংখ্যারা কতভাবে জড়িয়ে পড়েছে। সংখ্যাগুলো ছাড়া সত্যি সত্যিই প্রতিটি দিন যেন অচল হয়ে যেত তার। শতদ্রুও ঠিক জন্মের সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে গেছে একটি সংখ্যা। সেই সংখ্যা আজ হয়তো জুড়ে আছে অমৃতাভর সাথে, কিন্তু বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরো অসংখ্য সংখ্যা এসে শতদ্রুকে পৃথক এক

সত্তায় টেনে নিয়ে যাবে। ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়েই পড়ল অমৃতাভ।

**সংখ্যাতত্ত্ব**

একক দশক শতক সহস্র। ছোট্টবেলা থেকে শিখে-আসা সংখ্যা-পরিচয় ধীরে ধীরে জটিল সব হিসাবের যোগ-বিয়োগ, তত্ত্বতল্লাশ, নিয়মকানুন আয়ত্ত করতে শেখায়। ক্রমাগত ঢুকে পড়ে জীবনের প্রতিটি আদবকায়দায়, কল্পনা ও জীবিকায়। এমনকি, সেইসব কখন-যে সংখ্যা থেকে সংস্কারে পরিণত হয়ে যায়! অমৃতাভর জীবনে যেমন ২ সংখ্যাটি ঘুরেফিরে আসে। হয়ে ওঠে রক্তমাংসের। মানুষের সভ্যতা সংখ্যা দিয়ে সীমিত করতে চেয়েছে হিসাবের খাতা। ব্যাখ্যা করতে চেয়েছে স্থান-কাল-পরিসীমা। আবার সেইসঙ্গে গোলকধাঁধার মতো তাকে ঘুরিয়ে নিয়ে চলেছে শূন্য আর অসীমের অস্তিত্বেও। শূন্য সংখ্যাটি তাই বারবার বিধিনিষেধ থেকে কল্পনার অবাধ্যতায় মুক্তি দিতে চেয়েছে। আর অসীম তাকে জানিয়েছে মৃত্যুর অমোঘতা, যা ক্রমপ্রসারতা পেয়ে চলেছে বৃহতে। সব মানুষের বেলায় কী ঘটে— সেকথা জানে না সে। কিন্তু শূন্য, ২ আর অসীম নিয়ে গড়ে-ওঠা তার একান্ত নিজস্ব সংখ্যাতত্ত্ব অমৃতাভ প্রতিদিন মস্তিষ্ককোষে লিপিবদ্ধ করে চলেছে একটু একটু করে...

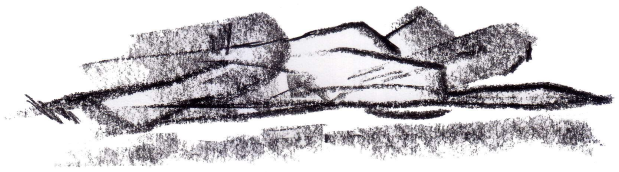

## নির্নিমেষ মুহূর্তের দিকে যাতায়াত

দৌড়। দৌড়। দৌড়। দৌড়েই চলেছে অমৃতাভ। রুদ্ধশ্বাস, বিহ্বল। ঠিক কোন্ মুহূর্ত থেকে যে এই প্রবল বেগের শুরু তা মনে করতে পারছে না। পরিচিত পথ থেকে পথে ঘুরপাক খেতে খেতে কখন যেন চলে এসেছে দিগন্তবিস্তৃত এক মাঠের কিনারে। জঙ্গলে শিকার ধরার সময় যেভাবে শিকারির দল শিকারকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় কোনো ফাঁদের কিনারে, জন্তুটিকে ক্লান্ত করে তোলে, সেভাবে অমৃতাভকেও কারা যেন তাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। ওদের অস্পষ্ট স্বর, উল্লাস, ওদের বালখিল্য উচ্ছ্বাস, খিস্তিখেউড়, জান্তব দেঁতো উচ্চারণ যেন অতি দূর গহ্বর থেকে কানে এসে পৌঁছোচ্ছে। সে জানে না ওরা কারা। পিছন ফেরে দেখবার সাহসও হচ্ছে না। এও জানে না, দৌড়োতে দৌড়োতে কোথায় পৌঁছাতে চাইছে সে? হৃৎপিণ্ড আর ফুসফুসের প্রবল শব্দ তাকে ঠেলে দিচ্ছে আরো তীব্র গতির দিকে। মাঠের কিনারে এসে তবু বুঝি কিছু স্বস্তি পায় শ্বাস। কিন্তু এই বিস্তারের কোন্ দিকে আশ্রয় পেতে পারে সে? দিগন্তবিস্তার এই উন্মুক্ততায় তার ভিতরে কেন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ছে? পুনরায় তাই দৌড়োতেই থাকে সে। যেন দৌড় থেমে গেলে উবে যাবে সে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। দৌড়ের আবেগ থেকে নিজেকে সে আর কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করার সাহস পাচ্ছে না। ক্রমশ জোরে, আরো জোরে দৌড়ে যেতে হবে। এইভাবে ছুটতে ছুটতে বুঝতে পারে পিছনের সেইসব তাড়নার চিৎকার চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে তাকে। নক্ষত্রের মৃদু আলোয় দেখতে পায় অসংখ্য হিংস্র চোখ এগিয়ে আসছে। ক্রমাগত ঘুরে যাচ্ছে সে আর, চারপাশে তাকে ঘিরে চলেছে জান্তব উল্লাস। যত এগিয়ে আসছে উচ্চারণগুলি, তত হারিয়ে যাচ্ছে তার বেগ, তার শ্রবণ, তার দৃষ্টি। চারদিকে অস্পষ্ট সব হাতের ভিতর ঝলসে উঠেছে অসংখ্য ধারালো সব ছুরির ফলা। তবে কি ওরা অমৃতাভকে হত্যা করতে চায়? হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে অমৃতাভ। অসহায়। ক্রমে ছুরিগুলি তার দিকে যত এগিয়ে আসতে থাকে, তত দূরে সরে যেতে থাকে সমস্ত কোলাহল, অশ্লীল ইঙ্গিত। অজস্র, অসংখ্য, অগণন ছায়ার ভিতরে কেবলই দুলে চলে সেইসব ছুরিকার তীব্র ফণা। মনে হয় সেগুলো

ঝুলে আছে মহাশূন্য থেকে, ট্রাপিজের নির্মম খেলায় উঠছে-নামছে অমৃতাভর সীমানাকে ঘিরে। অমৃতাভ কি জানতে চেষ্টা করবে সীমা? স্পর্শ করতে চাইবে ছুরিগুলোকে? কিন্তু এখন তো তার ভিতরে আর কোনো অবকাশ নেই, নেই আভোগ, নেই আকাঙ্ক্ষা, আবেগ, নেই আতঙ্ক বা আশ্বাস। যেন অবিরল আলস্য তাকে চলৎশক্তিহীন জড়তায় টেনে নিয়ে যেতে চাইছে ক্রমশ। তবু কী এক কেন্দ্রাতিগ টানে অমৃতাভর দুটি হাত শরীর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসে আঁকড়ে ধরে একখানা ছুরি, নির্মোঘ নিরুদ্‌বেগ আকর্ষণে ধীরে ধীরে এবং নিশ্চিন্ততায় টেনে নেয় হৎপিণ্ডের নিবিড় আশ্রয়ে। যন্ত্রণারুদ্ধ ঢলে পড়ে তার শরীর। মাটিতে। সে দেখতে পায় সেই মাটিতে কোল পেতে বসে আছেন মা। তাঁর কেশরাশি দিয়ে তিনি আলিঙ্গন করে নিয়েছেন অমৃতাভকে। হৎপিণ্ডের যত গভীরে প্রবেশ করতে থাকে ছুরিকা, ততই যেন আরাম অনুভূত হতে থাকে শরীরে। কোন্-এক নিবিড় আবেশে সে জড়িয়ে যায় মায়ের স্নিগ্ধ শরীরে আর, স্পষ্ট দেখতে পায় শতদ্রুর নিষ্পাপ চোখ দুটোকে। নিষ্পলক চেয়ে তার পানে। শতদ্রুর বাঁ-হাতখানি ছুঁয়ে শাশ্বতীর কোমল ডান হাত। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুতে ভিজে যাচ্ছে শাশ্বতীর মুখ, বুক, স্তন, পেট, জানু, পায়ের পাতা। বউয়ের এমন অপরূপ লাবণ্য কখনো প্রত্যক্ষ করেনি সে। নারীর এত সুন্দর আগে কখনো অনুভব করে ওঠে নি। ধীরে ধীরে তাই যেন অমৃতাভ একটিমাত্র শরীরে দেখতে পেয়ে যায় নিজেকে, মাকে, শাশ্বতী আর শতদ্রুকে। চারটি ভিন্ন প্রসন্ন মুদ্রা একই ফ্রেম জুড়ে পরস্পর আলগা হতে হতে সরে যাচ্ছে দূরে। সে চেষ্টা করে সবাইকে স্পর্শ করতে, কিন্তু তার আগেই ছায়ারা এসে জড়িয়ে ফেলে অস্তিত্ব। যেন তার জন্য চারপাশের এই অভ্যস্ত জগৎ আজ চিরদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে। এই প্রথম সে নিদারুণ কষ্ট পেতে চাইছে, কিন্তু কোনো বেদনাই পীড়া দিতে পারছে না তাকে। নিজের অস্তিত্বের ভিতরে থেকেও বিচ্ছিন্ন। হয়ে উঠেছে এক ছায়ার মানব।

বারবার অমৃতাভ স্পর্শ দিয়ে খুঁজতে থাকে তার রক্ত-মাংস-হাড়; তার শরীরকে। কিন্তু কোথাও খুঁজে পায় না তা। শুধু অন্ধকার, শুধুই ছায়া, শুধু কয়েকটি রঙের খেলা— বেগুনি, নীল, আসমানি, সবুজ, হলুদ, কমলা, লাল। শান্ত জলের ভিতর সেইসব রং আবিল হয়ে আছে। অমৃতাভ তাই আজ আর কোনো নাম নয়, সংখ্যারূপ নয়। কোনো পরিচয় নয়। 'অমৃতাভ' যেন সামান্য ক-টি অক্ষর— ভাষা- পরিচয়ের এক অবিমৃশ্য বোধ।

**ভাষাবোধ**

সকলেই জানে, মানুষের নিজেদের মধ্যে ভাব বিনিময়ের মাধ্যম হলো ভাষা। শ্রমের লাঘব বা



শ্রমকে গতি দিতেই তার জন্ম। কিন্তু নিজের সঙ্গে নিজের ভাব বিনিময়ের জন্য যা প্রয়োজন, তা হলো ভাষাবোধ। শুধুই ভাষা নয়, শুধুই বোধ নয়— এই দুইয়ের যুগল অমৃতাভকে রক্তমাংস থেকে অন্য এক সত্তায় বাঁচিয়ে তোলে; এক জীবন থেকে অসংখ্য জীবনে, জন্মান্তরে, অতীত থেকে ভবিষ্যতে বয়ে নিয়ে চলে। একদিন নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে এই পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারা— এই সৌরলোক। হয়তো জীবাশ্মে ভরে উঠবে সবকিছু। এক নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে অন্য নক্ষত্রপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়বে প্রাণ। হয়তো ছড়াবে না। তখনও কি থেকে যাবে ভাষাবোধ? আত্মজনের সংলাপ? অমৃতাভ জানে না তা। হয়তো আরো অনেক মানবজীবন পরে সে-উত্তর মিললেও মিলতে পারে। অমৃতাভ আজ যা পারে, তা শুধু তার রক্তমাংসের পোশাকটুকুকে ছিঁড়ে নির্মোহ নগ্ন হয়ে যেতে। তার হৎপিণ্ড, ফুসফুস, যকৃৎ, নাড়িভুঁড়ি ও কঙ্কাল, তার অণ্ডকোষ দুটির থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে। আত্মবিস্মৃত এক অমৃতাভের বোধে। আত্মবিবৃত এক ভাষার বিলুপ্তিতে। বানিয়ে-তোলা শব্দ ও অর্থবহতা থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার চেষ্টায়।

ক্রমশ অমৃতাভর চারপাশ থেকে ছায়ারা মিলিয়ে যেতে থাকে। মিলিয়ে যায় ছুরির তীব্র ফণাগুলি। সে আবারও শুনতে পায় শব্দ— অগণন পাখিদের ডাক। মৃদু আলোর আভা ছড়িয়ে পড়তে থাকে মাঠের উপর; তার শরীরে। অনন্ত সেই নির্জনের ভিতর সে খুঁজে পায় শতদ্রুকে। তার সন্তানকে। গাছের ছায়ায় বসে কী যেন পড়ছে— পাখির কলরবে সেইসব একটু একটু করে অমৃতাভর কানে এসে প্রবেশ করছে। এক জগৎ থেকে অন্য-এক জগতে যেন এসে পড়েছে অমৃতাভ। সে জানে না এতক্ষণ কোন্ সময়ের ভিতরে ছিল আর, এখনই-বা কোন্ সময়ের ভিতরে প্রবেশ করতে চলেছে? রক্তমাংসের অনুভূতি তাকে একটু একটু করে ফিরিয়ে দিচ্ছে তার চেনা আকাশ, চেনা মাটি, চেনা আবেশ। আবার মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল সে; হেঁটে যেতে চাইল সেইসব গাছের ভিড়ে, যেখানে শতদ্রু বসে আছে আর আপন মনে পড়ে চলেছে কোনো বই। কিন্তু বড়ো শিথিল হয়ে গেছে তার দেহ, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবু সেই নিবিড় ছায়ায়, নিরুদ্‌বেগ গাছের আশ্রয়ে, শতদ্রুর উচ্চারণের টানে ক্রমশ এগিয়ে যেতে থাকে। কিন্তু শতদ্রুর কাছে পৌঁছাতে পারে না আর। হঠাৎই চার-পাঁচজন লোক একটা কালো অ্যাম্বাসাডার থেকে নেমে ঘিরে ফেলে তাকে। জোর করে ধরে গাড়িতে চালান করে দেয়। এরা কারা? কোথায় নিয়ে যেতে চাইছে তাকে? অমৃতাভ চিৎকার করতে চাইছে, কিন্তু গলা দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরিয়ে আসছে না। তার তীব্র গোঙানির স্বর, অস্থির দেহ তোলপাড় করতে থাকে গাড়ির ভিতর। লোকগুলো সজোর আঘাতে থামিয়ে দেয় তাকে। সে নিশ্চেতন হয়ে যেতে থাকে আর, সেই অচৈতন্যের ভিতর তবু শুনতে পায় শতদ্রুর কণ্ঠে উচ্চারিত তারই কবিতার অবজ্ঞাত অর্বাচীন শব্দগুলিকে—

*ছেড়ে যাবার মুহূর্তে রেখে যাচ্ছি অস্বীকার, অবসিত ঋণ*
*ছেড়ে যাচ্ছি অবিশ্বাস— যাপনের; চেনা সংলাপ—*

*রেখে যাচ্ছি বিস্মরণ, শরীরে শরীর*
*কথাবলা-মুহূর্তের রাত্রিদিন চলা;*
*ছেড়ে যাচ্ছি পরিণামহীন কিছু গোপন অধ্যায়,*
*বয়ঃকাল, কোনোদিন জানবে না তুমি*

*জানবে না সকরুণ ভুলের মার্জনা—*
*জানবে না তবু ছেড়ে, ছেড়ে যাচ্ছি রাতের পোশাক*

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/